পাঁকের ফুল

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

দাম—৫

প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ ধর
আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মহালয়া
১৩৩৫

শ্রীনরসিংহ প্রেসে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

অর্পণ

স্বর্গগত

পিতৃদেবের

পাদ-পদ্মে

পাঁকের ফুল

পাঁকের ফুল
চেনা-অচেনা
পথের বিপদ
মীনা
অপরিচিতা
পাহাড়ের মায়া

পাঁকের ফুল

পাঁকের ফুল

দীর্ঘ দিন পরে স্বদেশের বুকে পা দিয়েই দেখি, সারা বাংলা এক শিল্পীর গৌরব গাথায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। দেশের কবি তাকে যশের জয়-টিকা পরিয়ে দিয়েছেন, তরুণের দল তাকে বরণ ক'রে নিয়েছে প্রীতি পুষ্পের অর্ঘ্য দিয়ে, নারীদের মনের মহলেও দেখলুম তার প্রতিপত্তির অন্ত নেই। অকস্মাৎ এমনি ক'রে ধূমকেতুর মতো বাংলার নিঃসাড় মনকে নাড়া দিয়ে যে সচেতন ক'রে তুলেছে, তার শিল্প-সৃষ্টি দেখবার জন্য মনের ভেতরে একটা অদম্য কৌতূহলের সৃষ্টি হ'লো।

পাঁকের ফুল

আমি যখন সাগরের পারে পাড়ি জমিয়েছিলুম, বাংলার সাময়িক পত্রিকাগুলোতে তখন ছবি দেওয়ার রেওয়াজ সুরু হয় নি—ভারি ভরাট প্রবন্ধে তাদের কলেবর ভ'রে উঠ্‌ত। এখন সে প্রবন্ধের গৌরব লঘু হ'য়ে গেছে এবং তার যায়গায় উড়ে' এসে জুড়ে' বসেছে পটুয়াদের পট। সুতরাং এই তরুণ শিল্পীর শিল্পলক্ষ্মীর পরিচয় পেতে বেশী দেরী হ'লো না। বড় একখানা মাসিকের পাতা ওলটাতেই তার ছবির নমুনা আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে' উঠ্‌ল।

ছবি দেখে খুসী হ'তে পার্‌লুম না। আর্টের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় ভাবাভিব্যঞ্জনার কোনো ছাপই তার ভেতর নেই—একটা অতি স্থূল লালসার ক্লেদে চুপিয়ে ছবিগুলোকে রঙ্‌-চঙ্‌-এ ক'রে তোলা হয়েছে। ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি স্থানের রূপ-দক্ষদের রূপের লেশায় চোখ্‌ দু'টো তখনো মশ্‌গুল হ'য়ে ছিল। তাই বাংলা দেশ হঠাৎ এমন তালকানা হ'য়ে গেছে ভাব্‌তেও মনটা খানিকটা খিঁচ্‌ড়ে গেল। অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়েই বন্ধু নীতীশকে জিজ্ঞাসা করলুম—এ লোকটার শিল্প-বিত্তার নমুনা যদি এই হয়, তবে একে তোমরা মাথায় ক'রে এত নাচ্‌ছ কেন?

পাঁকের ফুল

নীতীশ বল্‌লে—মামুলী ধরণের ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমাদের চোখে চাল্‌সে ধরেছে, তাই শক্তির ছাপ যেখানে আছে তাকে তোমরা বুঝ্‌তেও পারো না—সইতেও পারো না। ধোঁয়ার সৃষ্টি ঢের হয়েছে, এখন কিছুদিন সেটা না হয় থাক্‌। মানুষ যখন রক্ত-মাংসের জীব, তখন তাদের কাছে দুনিয়াটাকে দুনিয়া ক'রেই যদি কেউ দেখাতে চেষ্টা করে, তবে সে মহাভুল করেছে এ কথা মনে কর্‌বার কোনো কারণ নেই। তোমাদের মতো রুচিবাগীশেরাই তো আর্টটাকে জাহান্নামে দিতে বসেছে। জানো তো অস্কার-ওয়াইল্ডের সেই কথা—'It is better to be beautiful than to be good.' সাধু এবং শিল্পীর স্বপ্নের ভেতর ঢের তফাৎ! এই যে শিল্পী—একে যদি দেখ্‌তে! এর ছবি যেমন অফুরন্ত প্রাণের উৎস, এর জীবনটাও তেমনি উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রবাহে পরিপূর্ণ—যেমন চঞ্চল—তেমনি সুপ্রচুর!

আমি হেসে উত্তর দিলুম—এই অস্কারই আবার বলেছেন, 'It is better to be good than to be ugly.' রুচির দিক্‌ থেকে যা কুৎসিত, যা বীভৎস, সত্যকার শিল্প-জগৎ তাকেও প্রশ্রয় দেয় না। তোমার বন্ধুর ভেতর যদি অফুরন্ত প্রাণের উৎস থাকে, সে ভালো কথা। কিন্তু

পাঁকের ফুল

প্রাণের পরিচয় যদি তোমাদের ঐ ছবিগুলো হয়, তবে সে প্রাণ কারো ভেতর না থাকাই ভালো।

তর্কের খাতিরে প্রাণকে তো উড়িয়ে দিলুম। কিন্তু সে প্রাণ যে আমার বুকেই মৃত্যু বাণ হেনে, তারি রক্ত পান ক'রেই বাণ হ'য়ে উঠেছে তা কি তখন জানতুম!

* *
*

* *
*

মিনতি ছিল আমার প্রতিবেশী। ছোট-বেলা থেকে তার সাথে একসঙ্গে খেলা করেছি। তারপর বড় হ'য়েও তাকে পেয়েছিলুম, কিন্তু সে আর এক ভাবে। তাই যাবার সময় যখন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, চোখের জলে বান ডাকিয়ে সে বল্‌লে—যত শীগ্‌গির পারো, ফিরে এসো সমীর-দা'। মনে রেখো, তোমার হাতের স্পর্শ ছাড়া আমার চোখের ধারার এ সোতা কথনো শুকোবে না।

বিদেশের শুষ্ক মরুভূমিতে মিনতির চোখের জলের সেই ঝর্ণাই ছিল আমার সব আনন্দ, সব সান্ত্বনা। ভবিষ্যতের গাছে যত সোনার ফল ফলিয়েছি, হীরের ফুল ফুটি—

তাদের সবাইকে তাজা ক'রে রেখেছিল সেই চোখের জলের ঝর্ণাটা। কিন্তু কল্পনার সে স্বর্গটাও আমার অকস্মাৎ একদিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ভেঙে, টুটে,' রেণু-রেণু হ'য়ে পথের পাশে পায়ের ধূলোর তলেই লুটিয়ে পড়্‌ল।

ফের্‌বার প্রায় সময় হ'য়ে এসেছে, হঠাৎ এক দিন মিনতির চিঠি পেলুম। সে লিখেছে—আমায় মাফ ক'রো সমীর-দা', অন্য যায়গা থেকে আমার ডাক এসেছে ভাই, আমি তোমার জন্য সবুর করতে পার্‌লুম না। আমার হৃদয় যে ভাবে নিজেকে তোমার পায়ে বিলিয়ে দেবে ব'লে শপথ নিয়েছিল, সে শপথ তার ভেঙে গেল। যদি পারো, তোমার এই চঞ্চল-চিত্ত বোন্‌টাকে ক্ষমা ক'রো। হৃদয়টাকে ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে যে ভুল হয়েছিল, জানি, সে ভুলের জের টেনে চলাকে তুমি অপমান ব'লেই মনে কর্‌বে। তোমার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি, কিন্তু তাকে অপমান কর্‌বার সাহস আমার নেই।

এ চিঠির উত্তর দেবার কোনো দরকার ছিল না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে আস্‌বার দরকারটাও ক'মে গিয়েছিল। তারপর দু'টি বছর ছন্নছাড়ার মতো বিদেশের পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গলে ঘুরে' মনের দিক্ দিয়ে সর্ব্বরিক্ত এবং জ্ঞানের দিক্ ...ক্ষ পুরো মাত্রায় নাস্তিক হ'য়ে বাংলার বুকে ফিরে এসেছি

বটে, কিন্তু মিনতিদের বাড়ীতে এখনো পা দিতে পারি নি। যে মিনতি আঠারোটি বৎসরের সম্বন্ধ একখানা চিঠির মারফৎ শেষ ক'রে দিতে পারে, তার কাছে দাঁড়াবার সাহস আমারও ছিল না, যে আমি সাহসে ইউরোপের বে-পরোয়া পাহাড়ী-দের দলকেও পরাজিত ক'রেছিলুম।

কিন্তু মিনতির সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার কার্‌বার যে শেষ হয় নি, সে কথা ভালো ক'রে বুঝ্‌লুম সেই দিন যে-দিন মিনুর চিঠি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এক তাড়া কাগজ এসে আমার কাছে হাজির হ'লো।

সে লিখেছে—যাবার বেলা আবার তোমার কাছে মাফ চাইছি সমীর-দা'। এবার আমার আহ্বান এসেছে কোনো মানুষের কাছ থেকে নয়, পরপারের অজানা লোক থেকে—যদিও জানিনে সে লোকের মালিক ভগবান্ না শয়তান! তুমি যে আমাকে ক্ষমা করতে পারো নি, তা তখনি বুঝেছি যখন দেশে পা দিয়েও তোমার মিনুর কাছে ছুটে' আসা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। পাপটা যে আমার ছোট তা বল্‌ছিনে। কিন্তু যদি জান্‌তে ভাই, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে কি ভাবে করতে হয়েছে!

ধ্রুব আশ্রয়কে পরিত্যাগ ক'রে যে আলেয়ার পেছনে ছুটে' চলে, মরণ ছাড়া তার গতি নেই। সেই মরণের

স্পর্শই প্রতিমুহূর্তে আমি নিজের ভেতরে অনুভব করছি, সে স্পর্শ তুষার-শীতল। কিন্তু যার বুকে রাবণের চিতা তার কাছে তুষারের রক্ত-জমানো ঠাণ্ডা স্পর্শও তো অবাঞ্ছনীয় নয়!

হয়তো মরণটা এত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে না আসলে আমার অশ্রু-সজল জীবনের কাহিনীটি তোমার কাছে ছাপাই থেকে যেত। কিন্তু আমার জীবনে সব চেয়ে যে বড় আনন্দ এবং সব চেয়ে যে বড় শত্রু, মরণেও তার কথাটা আমি ভুলতে পারছিনে। পত্র লিখে' সব কথা জানিয়ে যাবো সে শক্তিটাও আমার নেই। জীবনের হাসি-কান্নাগুলো সময় সময় খাতার ওপর এঁটে রাখবার অভ্যাস তোমার কাছেই পেয়েছিলুম। সেগুলো যাবার বেলা আবার তোমার পায়েই উপহার দিয়ে গেলুম। তোমার মিনুর জীবনের পানপাত্রটা কোন্ অমৃত-রসে ভ'রে উঠেছিল তার আভাস এর ভেতর থেকেই পাবে। হয়তো যে দুঃখ আজ না হোক্, দু'দিন বাদে তুমি ভুলতে পারতে, তার পথেও কাঁটা পড়ল। কিন্তু এ ছাড়া আমার যে আর কোনোই উপায় ছিল না ভাই! এত বড় রিক্ততা নিয়ে মরণের পথে আর বুঝি কেউ আমার আগে পা বাড়ায় নি—ইতি।

তোমার মিনু

পাঁকের ফুল

চিঠি শেষ ক'রে খাতার পাতাগুলো খুলে' বস্‌লুম। একে ঠিক ডায়েরী বলা যায় না। এলোমেলো-ভাবে কয়েকটা দিনের মনের ইতিহাস এর বুকে ধ'রে রাখা হয়েছে মাত্র। মাঝে মাঝে ভেতরে অনেকগুলো পাতা ছেঁড়া। প্রথম তারিখটা প্রায় দু'বছর আগের। বুভুক্ষু ভিক্ষুক যেমন ক'রে খাদ্যের পাত্রটার পানে ঝুঁকে' পড়ে, আমার দীর্ঘ দিনের উপোসী চোখ্‌ দু'টো তেমনি ক'রে খাতার পাতা-গুলো পড়্‌তে সুরু ক'রে দিলে :—

* *
*

* *
*

ডায়েরী লিখ্‌বার অভ্যাস নেই। কিন্তু জীবনের আজ্‌কের ঘটনাটা না লিখে' রেখেও তো পার্‌ছিনে। ফাল্গুন শেষ হ'য়ে গেছে, বসন্তের পালা ফুরিয়ে এলো। কিন্তু আমার মনের বন এ কি নতুন ফাল্গুনের আগমনের সাড়ায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে? বৈশাখের রুদ্র দেবতার মতো যার দীপ্তি, বসন্তের পেলব পুষ্পের মতো এ আলো সে কোথায় পেলে? আমার মনের বনের সমস্ত ফুল যে সে আলোর স্পর্শে আজ ফোটার উল্লাসে মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

শিল্পী সে। ছবির ভেতর রূপের শিখা ফুটিয়ে তোলা তার কাজ। কিন্তু তার দেহের শিখাতে যে মনের গোপন গুহাতেও আগুন ধ'রে যায়! তার দেহে আগুন, তার কথায় আগুন, তার চলার ভঙ্গীতে আগুন। মাগো-মা,

পাঁকের ফুল

এত আগুনও একটা মানুষের ভেতরে থাকে! অথচ এত আগুন নিয়ে যার কার্‌বার কি সহজ—কি স্বচ্ছন্দ তার গতি!

শিল্প-প্রদর্শনীতে তার ছবিগুলো টাঙানো ছিল। আর সেই ছবির সাম্‌নে সে দাঁড়িয়েছিল তার চার পাশে অফুরন্ত আনন্দের ঝড়ের দোলানি নিয়ে। ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মুখের দিকে চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম বল্‌তে পারিনে, কিন্তু তখনই আমার হুঁশ হ'লো যখন সে এসে একটা ছোট্ট নমস্কার ক'রে বল্‌লে,—ও-ছবিগুলো সব আমার আঁকা। তারপর কোনো দ্বিধা না ক'রেই সারা প্রদর্শনী ঘুরে' সে আমাকে ছবি বোঝাবার ভার নিলে। বুঝ্‌লুম, ছবির সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে সে মোটেই ওস্তাদ্ নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য জোর তার বলার ভঙ্গীতে। সে জোরের বর্ম্ম ভেদ ক'রে তার জ্ঞানের ভেতর যে অজস্র দীনতা রয়েছে, কোনো ফাঁকেই যেন তারা মাথা তুলে' দাঁড়াবার পথ খুঁজে' পেলে না।

এই বলার ভঙ্গীই যখন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ তখনই সে একবার থেমে গেল। তারপর কি একটু ভেবে তার শিশির-দিয়ে-মাজা স্বচ্ছ কালো চোখ্ দু'টো আমার মুখের দিকে তুলে' ধ'রে বল্‌লে—আপনার বাড়ীতে আমার একদিন নিমন্ত্রণ রইল। পার্‌লুম না এই দু'দণ্ডের দেখায় মনের ভেতর আপনার রূপের

রেখাটি এঁকে নিতে। অথচ এ রূপকে দেখে আমার তূলির রেখায় ফুটিয়ে না তুলেও তো আমি সোয়াস্তি পাবো না। এ তো রূপ নয়—এ যে একেবারে রূপের শিখা,—এ শিখাকে যে ধ্যান ক'রে মনের ভেতর লাভ করতে হয়। জানেন, আমাদের ধর্ম্মের ভেতর মূর্ত্তির বোঝা এত বেড়ে উঠেছে কেন? দেবতাকে ধ্যানের ভেতর পেতে হ'লেও যে গোড়ায় মূর্ত্তি একটা দরকার! আপনার দেহে রূপের যে দীপ্তি জ্বলছে আমি সেই দীপ্তিরই পূজারী। তবু অন্ততঃ আরো দু'-একবার না দেখ্‌লে তো তাকে আয়ত্ত করতে পারছিনে।

কি করুণ ব্যাকুলতা তার চোখের ভেতর কাঁপ্‌ছে! অপরিচিতের এই রূপের স্তুতিতে যতই মাদকতা থাক্, বাংলার মেয়ের পক্ষে তা বরদাস্ত না হওয়াই ছিল সঙ্গত। হয়তো আর কোথাও শুনলে তার ভেতরকার অপমানটাই আমাকে খোঁচার মতো ক'রে বিঁধ্‌ত! কিন্তু তার ওপরে রাগ করতে পারলুম না। ছবি দেখা শেষ ক'রে ফেরবার পথে তার নমস্কারকে নমস্কার দিয়ে অভিনন্দিত ক'রে ব'লে আস্‌লুম —কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

* *
*

* *
*

আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকার তখনো ভাল্লা ক'রে জমাট বাঁধে নি, কিন্তু ঘরের ভেতরকার আড্ডা পুরো মাত্রায় জ'মে উঠেছে।

চা'র টেবিলের চার পাশে সকলে ব'সে ছিল, আমি চা তৈরী কর্ছিলুম। হঠাৎ শিল্পী ব'লে উঠ্ল—মাধ্যাকর্ষণের জোর কত জানিনে, কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কিন্তু আপনাদের আকর্ষণের জোর আমি সমস্ত দেহ-মন দিয়েই অনুভব কর্ছি। সূর্য্যের আলো আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাবার আগেই আমার মন আমাকে টান্তে থাকে এই বাড়ীটার পানে। শুনেছি সমুদ্রের স্থানে স্থানে

চুম্বকের পাহাড় আছে। জলের বুক চিরে' এপারের জাহাজ ওপারের পানে পাড়ি জমাতে জমাতে হঠাৎ যদি এই চুম্বকের পাহাড়ের আকর্ষণের ভেতর এসে পড়ে, তবে তার ইঞ্জিনের ময়দানবও আর তাকে রুখ্‌তে পারে না। আমার অবস্থাও সেই জাহাজের মতোই হয়েছে। জানিনে তারি মতো আমাকেও মাঝ্‌-দরিয়ায় বানচাল হ'তে হ'বে কিনা। ব'লেই সে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লে।

সে হাসি তার আমাকে ব'লে দিলে—ওগো, এ বাড়ীর চুম্বক পাহাড়—সেতো তুমি! আমার মনের শিল্পী-ময়দানবও-তো তাই এ দেহটাকে আর রুখ্‌তে পারছে না। শিল্পীর ধ্যানালোকে যে মানসীর চরণ-স্পর্শে সৌন্দর্য্যের শতদল পাপ্‌ড়ির পর পাপ্‌ড়ি মেলে ফুটে' ওঠে, সেই মানসীর সন্ধান পেয়েছি আমি তোমার মুখে। তাই তো সৌন্দর্য্যের মাতাল হৃদয়টা আমার এমন ক'রে বাঁধা পড়েছে তোমারি দুয়ারে। আর তো আমার ফের্‌বার উপায় নেই।

তার সে হাসির ভাষা সহসা আমার মনকে একটা নাড়া দিয়ে যে কাঁপন জাগালো তারি বেগ সাম্‌লাতে গিয়ে, হাত টল্‌কে খানিকটা গরম চা আমার হাতখানাকে একটু সাঁ্যাকো দিয়ে, আমার পেঁয়াজি রঙের শাড়ীর প্রান্তটা ভিজিয়ে

মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌ল। হাতটা জ্বালা করতে লাগ্‌ল। তবু মনে হ'লো এ ভালোই হ'য়েছে, নইলে এই স্তুতির গান আমার বুকের ভেতর যে সমুদ্রের মন্থনকে জাগিয়ে তুলেছে, তাকে আমি কি দিয়ে সম্বরণ করতুম!

শিল্পী ত্রস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে' বল্‌লে—এই দেখুন, ব'কে ব'কে আপনার হাতটা পুড়িয়ে দিলুম। আমার যদি কোনো বুদ্ধি থাকে।

আমি হেসে বল্‌লুম—কিচ্ছু লাগে নি আমার। বসুন আপনি, আপনার চা তৈরী হ'য়ে গেছে।

চা'র বাটিতে চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে শিল্পী বল্‌লে—সমুদ্র-মন্থনের সময় সুধা এবং লক্ষ্মী এক সঙ্গে উঠে' এসেছিল, এ হচ্ছে হয়তো নিছক কাব্য-কথা। কিন্তু এ কাব্য জীবনেও যে সত্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে তার প্রমাণ পাচ্ছি আজ্‌কের এই চা'র বাটিতে চুমুক দিয়ে। লক্ষ্মীর হাত ছাড়া তো সুধার পরিবেশন চল্‌তে পারে না। লক্ষ্মীর হাতের এই পরিবেশনই তো প্রতিদিন চলেছে আমাদের দেহে, আমাদের মনে, আমাদের সকল কাজে, সকল চিন্তায়, এমন কি আমাদের শিল্প-সৃষ্টিতেও। আমি যে এখানে এত বেশী আসি তার কারণ, এইখান থেকেই প্রতিদিন আমি আমার শিল্পের খোরাক জোগাড় ক'রে নিয়ে যাই।

মা একটু হেসে বল্লেন—ওকে অত বেশী প্রশংসা ক'রো না বাবা, ওর অহঙ্কার বেড়ে যাবে। সমীর বল্ত, মেয়েদের মুখের ওপর প্রশংসা করতে নেই, তাতে তাদের মাথা ভারি বিগ্ড়ে যায়।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে শিল্পী তার কালো কোঁক্ড়ানো চুলের গুচ্ছগুলো একটা ঝাঁকিতে সোজা ক'রে তুলে' বল্লে—কক্খনো না; আমাদের পূজার মন্ত্রই তো হচ্ছে নারীর এই স্তব গানের সমষ্টি! কিন্তু সমীর কে?

মা বল্লেন—সমীর সেন, ষ্টেট-স্কলারশিপ নিয়ে যে বিলাতে সিভিল-সার্ভিস পড়্তে গেছে। তার সঙ্গেই তো আমার মিনুর বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে।

৫

শিল্পীর দিকে চেয়ে দেখ্লুম, আসন্ন আষাঢ়ের একখণ্ড কালো মেঘ হঠাৎ যেন আকাশের প্রান্ত ছেড়ে তার মুখের প্রান্তে খ'সে পড়্ল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই একটা ধার-করা হাসির বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘখানাকে আগাগোড়া ঢেকে ফেলে সে বল্লে—এত বড় সুখবরটা আমাকে তো এর আগে দেন নি। সমীর বাবুর ফিরে' আস্বার কত দেরী?

আমার ছোট বোন্ রীতি হেসে উত্তর দিলে—এ তো ফাল্গুন মাস, এর 'আগুনে' হাওয়ার ফাঁড়াটা যদি মিনতি দি'

কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে, তবে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র আগেই সমীর বাবু ফিরে' আস্‌বেন।

পেয়ালাটা নিঃশেষ ক'রেই শিল্পী উঠে' দাঁড়ালো। তারপর ম্লান হাসিতে চোখের পাতা দু'টো ভিজিয়ে তুলে' আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে—মনে কর্‌বেন না আমার উপদ্রবের হাত থেকে আপনি বেচে গেলেন। সমীর বাবুর হাকিমী মেজাজ হয়তো শিল্পীর খেয়ালকে বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌বে না। তাই তাঁর ফিরে' আস্‌বার আগেই আমি আমার স্তুতির পালা শেষ ক'রে নিতে চাই!

রাত নিবিড় হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তবু ঘুম আস্‌ছে না। সেই শিল্পীর কথাই বার বার ক'রে মনে পড়্‌ছে। ঝড় যেমন ক'রে দুনিয়াটাকে দোলা দিয়ে যায় তেমনি দোলা যার আসা এবং যাওয়ার ভেতর দুলে' ওঠে, কে তাকে ভুল্‌তে পারে!

যতক্ষণ সে সাম্‌নে ছিল, তার পা'র তলা হ'তে চুলের ডগাটি পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটাই যেন বল্‌ছিল—আমি আছি—আমি আছি! কি যে আছে, আর কি যে নেই, বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌বার কথাটাও আর তখন মনে ছিল না। সে যখন

চ'লে গেল তার পেছনে রেখে গেল তার সেই বড় বড় ডাগর চোখের অদ্ভুত অপূর্ব্ব দৃষ্টি। সাপের চোখে এক রকমের দৃষ্টি থাকে, যার ওপর চোখ্ পড়্‌লে পা আর ফেরানো যায় না। শুনেছি, কোনো কোনো মানুষের চোখেও নাকি সেই রকমের দৃষ্টি আছে। এ কথা সত্য কি না জানিনে, কিন্তু মানুষের চোখেও যে এমন আকর্ষণী শক্তি থাকে, তাকে না দেখ্‌লে হয়তো সে কথাটাও কখনো বিশ্বাস করতুম না।

এই জীবনেই তো আরো একটি দৃষ্টির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সে দৃষ্টি যেমন শান্ত, তেমনি মধুর, তেমনি ত্যাগের আনন্দে পরিপূর্ণ। এতদিন আমার জীবনের ওপর সেই দৃষ্টিই তো ধ্রুবতারার মতো আলো দিয়েছে। কিন্তু এর ক্ষুধিত শাণিত লালসা তপ্ত দীপ্ত দৃষ্টি যে তার জ্যোতিকেও ম্লান ক'রে দিলে। আপনাকে বিলিয়ে দেবার শক্তি যত বড়ই হোক্ না কেন, মানুষকে জয় করে তারাই, যারা জোর ক'রে কেড়ে নেয়। সভ্যতার এই পরিপূর্ণতার যুগেও মানুষ তার অসভ্য মনটাকে একেবারে ছেড়ে ফেল্‌তে পারে নি।

আলিপুরে বেড়াতে গিয়ে সেদিন একটা সিংহ দেখেছিলুম। সেটা নাকি সন্ত সন্ত ধ'রে আনা হয়েছে। তার

গতি আমার ভারি ভালো লেগেছিল। সেই কাউকে-কেয়ার-না-করা সিংহের গতির সঙ্গে এর গতির একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। হেসে গেয়ে কথা ব'লে সে চ'লে গেল। তার সে হাসি-গান-কথার ভেতর শিল্পীর যোগ্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য বোধ হয়তো কিছুই নেই। তবু তার রেশ অক্ষয় হ'য়ে জেগে রইল আমার কানে—আমার বুকের মাঝখানে।

* *
*

* *
*

কাল রাত্রিতে হঠাৎ বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। যে আকাশ তার আগুনের ধারায় ধরণীর তরুণ সৌন্দর্য্যের ওপর ম্লান পাণ্ডুরতার রেখা টেনে দিয়েছিল, মেঘের চুম্বন ঢেলে সেই আকাশই আবার তাকে স্নিগ্ধ শ্যামল ক'রে দিলে। পৃথিবীর এই স্নাত শুভ্র সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে আজ আবার চোখ্ জুড়িয়ে যায়।

আজ যে পয়লা বৈশাখ, সে কথাটা আমাদের কারো

মনে ছিল না। শিল্পী এসে তার নববর্ষের অভিবাদন জানিয়ে সে কথাটা আমাদের মনে পড়িয়ে দিলে!

রীতি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—

"Now the New year reviving old Desires
The thoughtful soul to solitude retires"

দিদি তুমি কোন্ নিভৃতে লুকোবে বলো?

শিল্পী ধীরে ধীরে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আমার একটা 'পুরনো' ইচ্ছা যদি পূর্ণ করেন!

আমি বল্‌লুম—কি?

শিল্পী বল্‌লে—আজ আমাকে আপনার ছবি আঁক্‌বার অনুমতি দিন!

একটা আচম্‌কা আনন্দের বন্যায় বুক ভ'রে গেল। কোনো রকমে সে ধাক্কাটাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লুম—না, থাক্।

একটু আর্দ্র কণ্ঠে সে বল্‌লে—বৎসরের প্রথম দিনটাতে আমাকে বিমুখ করবেন না আপনি। জানেন, সব শিল্পীরই একটা সংস্কার আছে, বৎসরের প্রথম দিনটা যদি ব্যর্থ হয়, সারা বৎসর তার চল্‌তে থাকে সেই ব্যর্থতার জের টেনে।

আর আপত্তি করা চল্‌ল না। বস্‌বার যায়গাটা ঠিক

ক'রে দিতেই খানিকটা দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে সেই খানটাতে ব'সে পড়লুম। একটু পরেই শিল্পী ডুবে' গেল তার তুলি রং আর ক্যানভাসের ভেতর। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলুম, আগুনের শিখা কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলোকে ঢেকে ফেলেছে।

আমের মঞ্জরীর সুরভিতে বাতাস ভরপুর। পাখীগুলোর অকারণ কূজন গুঞ্জনে স্তব্ধ বনতল মুখরিত। রোদ্দুর ভেতর দিয়ে ঝ'রে পড়ছে প্রকৃতির তরুণ যৌবন--রূপের নেশায় ভরা, সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যে উচ্ছল--চঞ্চল। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখেও স্বপ্নের ঘোর ঘনিয়ে আসছে।

•

চুলের একটা গোছা হঠাৎ বাতাসে উড়ে' এসে আমার মুখের ওপর পড়তেই হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিয়ে সে বললে—ভারী সুন্দর হয়েছে আপনার Poseটা। কিন্তু আমি পারছিনে এত সৌন্দর্য্য আমার তুলির রেখায় ফুটিয়ে তুলতে। রূপের পূজা আমার ব্যবসা, কিন্তু সে রূপ কি ক'রে ধ্যান করব যার সীমা নেই—শেষ নেই। ব'লেই তুলিটা ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে সে উঠে' দাঁড়ালো।

আমি হেসে বললুম—আমার নিজের দৈন্যটা মিথ্যে প্রশংসা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করবেন না। আমি তো

গোড়াতেই মানা করেছিলুম আপনাকে।—এ ছাই চেহারা না কি আবার ছবিতে তোলায়!

বিস্মিত বিহ্বল চোখদু'টো আমার মুখের পানে তুলে' ধ'রে সে বল্লে—জানেন, আপনি কি বল্ছেন! আমার নিজের শক্তি যে কত বড় তা আমি জানি এবং এ শক্তির দীনতা এর আগে এমন ভাবে আমি আর কখনো অনুভব করি নি! কিন্তু এ পরাজয়ের জন্য আমার এতটুকু লজ্জা নেই। বিদ্যুতের শিখার কতটুকুই বা কোন্ শিল্পী ফোটাতে পেরেছে!

ফেলে দেওয়া তুলিটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে সে আমার ছবি আঁকতে সুরু ক'রে দিলে। তার মুগ্ধ ক্ষুধিত দৃষ্টি ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে আমার মুখের ওপর খ'সে-পড়া উল্কার আলোর মতো ঝ'রে পড়্তে লাগ্ল। সে আলো আমার বুকে কি রোশ্নাই জ্বালালে কে জানে!

শিল্পী তার তূলির খেলা বন্ধ ক'রে আবার ব'লে উঠ্ল—আপনি মুহুর্মুহু এত বদ্লাচ্ছেন কেন বলুন তো? সেই জন্যই তো আমার আরো খেই হারিয়ে যাচ্ছে? আপনার মুখটা হঠাৎ কি লাল হ'য়ে উঠেছে দেখেছেন! ও লালকে ফুটিয়ে তোল্বার উপযুক্ত রঙ্ তো আমার ভাণ্ডারে নেই। আঃ, যদি আগুনটাকে আমার রঙের ভাণ্ডারের ভেতর

পেতুম! তার পরেই উঠে' এসে হঠাৎ তার হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে আমার দু'টো হাত একেবারে তার বুকের ওপর টেনে নিয়ে বল্‌লে—তুমি শিল্পীর সাধনার জিনিষ—শিল্পী তো তোমাকে ছাড়্‌তে পারে না। হয় তো আই সি এস-এর মোহ্‌ আজও তোমাকে জড়িয়ে ধ'রে আছে। কিন্তু কলা-লক্ষ্মী তো কুবেরের ভাণ্ডার থেকে উঠে' আসেন নি, তাঁকে নিখিল সৌন্দর্য্যের ভেতর থেকে তিল তিল ক'রে চুইয়ে নিয়ে রূপ দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে শিল্পী। এই তিলোত্তমা তো শিল্পীরই একমাত্র সম্পদ। সে অর্থ চায় নি, মান চায় নি, সুখও সে চায় নি—কেবল চেয়েছে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিটুকু। কে সে সমীর সেন, যে কেবলমাত্র শক্তির দম্ভে তোমাকে কেড়ে নেবে তোমার সত্যকার যেখানে সার্থকতা সেই সার্থকতার সিংহাসন থেকে। এই যে অপরূপ আগুনের খেলা চলেছে তোমার চুলের আগে, নাকের ডগা, হাতের আঙুল, বসনের প্রান্ত ঘিরে, সে আগুন আমার মনকে নতুন নতুন রহস্যের সন্ধান দিয়ে নব নব সৃষ্টির পুলকে বিহ্বল ক'রে তুল্‌ছে, সে কি কোনো দিন এই সব রহস্যলোকের সন্ধান পাবে? তবে তোমার ওপর তার কিসের জোর? কেন সে তোমাকে কেড়ে নেবে, তোমার ওপর সত্যকার যার অধিকার তাকেই বঞ্চিত ক'রে?

উত্তেজনায় তার দেহ থর্-থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্ল। আর তারি একটা ঢেউ চারিয়ে গেল আমার সমস্ত দেহে মনে, আমার রক্তের কণাগুলোর ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে তার কথার অস্পষ্ট ইঙ্গিতটাও যেন মূর্ত্তি ধ'রে উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

দৃষ্টি যে কথা কয়—মানুষের মুখের ভাষার চাইতেও জোরালো ভাষায় দাবীর আর্জ্জি পেশ করে, তার পরিচয় পেলুম সেদিন সেই শিল্পীর দৃষ্টির ভেতর দিয়ে। তার হাত দু'টো হাতের মুঠোর মধ্যে জোরে চেপে ধ'রে বল্লুম—বন্ধু, আগুনের রথে চ'ড়ে তুমি জয়-যাত্রার পথে বেরিয়েছ। তোমার গতি কে রোধ করবে? তোমার তূণের বাণ তো ফাল্গুনের সেই সব বাণের চেয়ে কিছুমাত্র কম জোরালো নয়, যারা স্থবির শীতের কুয়াশাকে উড়িয়ে যৌবনের দীপ্তি দিয়ে ধরণীর বুকে বসন্তের আনন্দকে ফুটিয়ে তোলে!

জয়ের উচ্ছ্বসিত হাসিতে শিল্পীর অধর ভ'রে গেল। তারপর সেই অধর ধীরে ধীরে নেমে এলো আমার বিস্রস্ত বিক্ষিপ্ত চুলের অরণ্যে, বিস্ফারিত ললাটের তটে, লজ্জারক্ত অধরের ওপরে। সে তো চুমো নয়, সে যেন তড়িতের রেখা, অপরূপ সুন্দর অথচ বজ্রের জ্বালায় জ্বালাময়!... ...

পাঁকের ফুল

দিনের আলোতে পারলুম না, রাত্রির অন্ধকারে সমীর-দা'কে লিখে' দিলুম আমার কবুল জবাব।

চলেছি—ছুটে' চলেছি, কোথায় কে জানে—নরকের অন্ধকারে কি স্বর্গের আলোকের পথে! আমার চোখের সাম্নে জগ্‌ছে কেবল দু'টি বড় বড় চোখের দৃষ্টি! সে দৃষ্টি সুন্দর কি কুৎসিত জানিনে; শুধু জানি সে অপরূপ, আর তার মোহ কাটিয়ে ওঠ্‌বার শক্তি আমার নেই!

* *
*

* *
*

ছ'টা মাস কোথা দিয়ে যে উড়ে' গেল কিছু টের পেলুম না। এ ছ'টা মাস আমার দেহের সমস্ত অণু পরমাণু ঘিরে' যেন বসন্ত জাগ্রত হ'য়ে উঠেছিল--তার শোভা নিয়ে, তার সৌন্দর্য্য নিয়ে, তার অপূর্ব্ব মাদকতার বন্যা নিয়ে। যৌবন যে হঠাৎ বাঁশীর শব্দ শুনে' জেগে ওঠে, এত দিন এ কথা নিছক কল্পনা ব'লেই মনে করতুম। কিন্তু শিল্পীর বাঁশী যখন আমাকে ডাক দিলে, চেয়ে দেখি, আমার দেহের ভেতরেই তা সত্য হ'য়ে উঠেছে। তার একটা ডাকেই আমার ক্ষুধার্ত্ত বুভুক্ষু যৌবন পরিপূর্ণতার প্লাবনে চারিপাশের খানিকটা টল্‌কে ছল্‌কে দিয়ে মনের অরণ্য ভেদ ক'রে যেন অকস্মাৎ বেরিয়ে এলো আমার দেহের দুয়ারে,—সদ্যোজাত গরুড়ের মতোই

তার অসীম শক্তি, বিজয়ী বীরের মতোই তার বিপুল স্পর্দ্ধা. ভোগের সুরায় তার পানপাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য সমস্ত বাড়ীর ভেতর আমার খ্যাতিই ছিল সব চাইতে বেশী। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় সেই সংযমের আবরণটা খ'সে পড়তেই মা বিস্মিত ও শঙ্কিত হ'য়ে আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন—মিনু, যে মাত্রায় তুই ছুটে' চলেছিস্ এ বাড়ীর পক্ষে তা কিছু নতুন জিনিষ নয়। কিন্তু আমি তো তোকে জানি, এ যেন তোর ধাতের সঙ্গে মোটেই খাপ্ খাচ্ছে না। আর এ তোর পক্ষে স্বাভাবিক নয় ব'লেই তোর সম্বন্ধে আমার ভয়ও যে ভাঙ্চে না মা!

আমি হেসে তাঁকে উত্তর দিলুম—আমার জন্য তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা। কলালক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য শতদলের দলগুলো ফোটাবার ভার যার ওপরে, বসন্তের হাল্কা হাওয়াই যে তার বাহন।

মা আমার কথা বুঝ্লেন কি না জানিনে। কিন্তু ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি চ'লে গেলেন।···

মা'র আর একটা দিনের কথাও আজ মনে পড়্ছে। স্নেহের দৃষ্টি এমনি অন্তর্যামী যে, যে-বিপদের আশঙ্কা কোনো দিন আমার মনেও স্থান পায় নি, মা'র কাছে তাই

যেন প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছিল। আকাশে সেদিন জ্যোৎস্নার সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে। তারি ঢেউগুলো গড়ের মাঠের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে-পড়া গাছগুলোর মাথায় জ্বল্‌ছিল। চাঁদের আলোর সেই বন্যায় আকাশের তারাগুলিও যেন ভেসে এসে ছিট্‌কে পড়েছিল দূরে দূরে রাস্তার ধারে ধারে যে গ্যাস-পোষ্টগুলি আছে তাদেরি কাচের জালে ঘেরা খাঁচার ভেতরে। সব জিনিষই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট নয়—সবই আব্‌ছায়া। এই আব্‌ছায়াই মনের রাজ্যে মায়ালোকের সৃষ্টি করে।

শিল্পীর সঙ্গে সারা সন্ধ্যা এই মায়ালোকের মধ্যে কাটিয়ে বাড়ী ফিরে' আস্‌তেই দেখি, মা আমার ঘরের ভেতর স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বল্লেন—ভারি ভাবিয়ে তুলেছিলি মিনু! এত রাত একা একা বাইরে তো থাক্‌তে নেই মা।

হেসে বল্লুম—একা ছিলুম না—শিল্পী সঙ্গে ছিল। মাঠে যা জ্যোৎস্না মা, যদি দেখ্‌তে, তোমারও ফির্‌তে ইচ্ছা হ'তো না।

আমার মুখে কি ছিল জানিনে। সেই মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মা বল্‌লেন—শিল্পী সঙ্গে থাক্‌লেই একা থাকার দোষ যে কাটে না, এটা বোঝার মতো বয়স তোমার

হয়েছে বাছা। তা ছাড়া, সমীর এগুলো পছন্দ হয়তো না-ও করতে পারে।

সমীর-দা'র সঙ্গে দেওয়া নেওয়ার সব সম্পর্ক যে একখানা চিঠির মারফৎ চুকিয়ে দিয়েছি, সে কথাটা মনে হ'তেই বুকের ভেতরটাতে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ্ ক'রে বিঁধ্‌ল। একটু ম্লান হেসে বল্লুম—সমীর-দা' কিছু মনে করবেন না মা। কিছু মনে করবার অধিকার আর তাঁর যে আমার ওপর নেই, চিঠি লিখে' সে কথাটা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি।

চেয়ে দেখ্‌লুম মা'র সেই চির-হাস্যোজ্জ্বল মুখ এক মুহূর্ত্তে একটা বেদনার আঘাতে ম্লান হ'য়ে কালো হ'য়ে গেল। অনেকক্ষণ তিনি স্তব্ধ হ'য়ে সেই যায়গাটাতেই দাড়িয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন—চিঠি লিখে' দিয়েছ?—আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসাও করলে না!

মা'র সে রকমের মুখ আমি আর কখনো দেখি নি। সেই কাতর বিহ্বল মুখের চেহারাটা আমার বুকখানাকে যেন হাতুড়ির পর হাতুড়ির ঘা দিয়ে পীড়ন করতে লাগ্‌ল। আমি মা'র বুকের পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বল্লুম—অপরাধ হয়েছে মা, আমাকে মাফ করো। কিন্তু সমীর-দা'কে আর একটা দিনও মিথ্যে আশায় ভুলিয়ে রাখা যে আমার পক্ষে অন্যায় হ'তো।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে আমার চুলগুলো আঙুল দিয়ে চিরে' দিতে দিতে মা বল্‌লেন—মা'র ব্যথা, মা'র ভয়-ভাবনা—এ যে কি রকমের তা তো জানিস্‌ নে! তোকে সমীরের হাতে দিতে পারলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু তা যখন হ'লোই না, আমি তোর বিয়েটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে ফেল্‌তে চাই। তুই না পারিস্‌ আমিই কাল শিল্পীকে বলব—

লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠে' মাকে বল্‌লুম—তোমাকে কিছু করতে হ'বে না মা, আমিই সব ঠিক ক'রে নেবো।...

পরের দিন শিল্পী আস্‌তেই হেসে বল্‌লুম—মা তোমাকে পাকাপাকি ভাবে বাঁধ্‌বার চেষ্টায় আছেন, অতএব সাবধান!

বড় বড় চোখ্‌ দু'টো আমার মুখের ওপর বিস্ফারিত ক'রে দিয়ে শিল্পী বল্‌লে—অর্থাৎ—

আমি বল্‌লুম—অর্থাৎ আমাকে যদি তোমার সত্যিকার প্রয়োজন থাকে, তবে তার আগে আমার ওপর তোমার দাবীর অধিকারটাকেই পাকা ক'রে নিতে হ'বে—এই হ'লো মা'র আদেশ!

মনে হ'লো শিল্পীর চোখের চেহারাটা এক মুহূর্তের জন্য

যেন বদ্‌লে গেল। কিন্তু তারপরেই হাত দু'টো আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে—মা'র কি আদেশ জানিনে, জান্‌বার প্রয়োজনও নেই আমার। তোমার আদেশ, সেই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট।

তার প্রসারিত হাত দু'টোর ভেতর আপনাকে ফেলে দিয়ে বল্‌লুম—ফুল যে কেন বিকিয়ে দেবার জন্য আপনাকে বিকশিত ক'রে তোলে, তোমাকে দেখেই তার কারণ বুঝ্‌তে পেরেছি বন্ধু! নারীর তো সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌বার অধিকার নেই!

* * *

* *
*

আরো কয়েকটা মাস ঝড়ের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। পেছনের দিকে তাকানো নেই। কেবল সাম্‌নের দিকে ছুটে' চলা—কি উদ্দাম তার গতি, কি উন্মাদ তার ভঙ্গী! রক্তের ভেতর যখন আগুন ধরে, তখন তার বাষ্প দেহটাকে ঝড়ের ভেতর দিয়ে এমনি ক'রেই টেনে নিয়ে যায়। মনের ইঞ্জিনকে সংযত ক'রে রাখা যার কাজ, সেও তখন মাতাল হ'য়ে উঠে' দু' হাত দিয়ে হাততালি বাজিয়ে রাশটাকে শ্লথ ক'রে দিয়ে অট্টহাসি হাস্‌তে থাকে।

কিন্তু ঝড়ের দোলাও থামে। আমার মনের ঝড়ের দোলা যখন থাম্‌ল, চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত দেহ রিক্ততায় ভ'রে গেছে—কোথাও নিজের ব'লে আর এতটুকুও অবশিষ্ট

নেই। কিন্তু এ রিক্ততার জন্য কোনো ক্ষোভ নেই আমার। নারী তো আপনাকে রিক্ত ক'রে দিয়েই সার্থক!

কিছু দিন থেকে শিল্পীর ভেতরেও একটা পরিবর্তন দেখ্‌তে পাচ্ছি। তার চুমোর ভেতরে যেন সে আবেশ আর নেই। আলিঙ্গন তার ব্যগ্র ব্যাকুল দুঃসহ অথচ মধুর বিদ্যুতের স্পর্শটাকেও যেন হারিয়ে ফেলেছে। হয়তো তার পিপাসা মিটে গেছে—কিন্তু আমি!—পিপাসায় যে এখনো আমার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আছে! হায় নারী, তুমি যখন রিক্ততার নেশায় মেতে ওঠো, পুরুষের মনে তখন চল্‌তে থাকে আপনাকে ভরাট ক'রে নেবার সাধনা। তবু এই পুরুষকেই নারী চিরকাল তার সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে এসেছে!

ব'সে ব'সে ভাব্‌ছি—মা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে' বল্‌লেন,—মিনু তোর বিয়ের দিন এই মাসেই ঠিক ক'রে ফেলল্‌ম।

আমি হেসে উত্তর দিলুন—বিয়ের মালিক তো আমি একলা নই মা!

মা বল্‌লেন—সে তো জানি, আর সেইজন্যই তো আমার আজ ভয়েরও অন্ত নেই! আজ ক'দিন তাকে দেখ্‌ছিনে।

এখন মাঝে মাঝেই এ রকম হচ্ছে। তার চোখের দিকেও তাকিয়ে দেখেছি, যে নেশার রঙ্ তরুণ-তরুণীর চোখে আলোর ঝর্ণা ঝরায় তা যেন ফুরিয়ে গেছে। এ কথাটা কি তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌নে? আমাকে লজ্জা করিস্‌নে মিনু, জানিস্, মা'র বাড়া বন্ধু মেয়ের আর দ্বিতীয় নেই!

মা'র পা'র ধূলো মাথায় তুলে' নিয়ে বল্‌লুম – আমার মা'র মতো মা যে পেয়েছে সে কথা কি তাকেও ব'লে দিতে হবে মা! কিন্তু বোঝা-বোঝির হিসেব-নিকেশের কোনো খোঁজই যে আমি রাখি নি।

চেয়ে দেখ্‌লুম, চিন্তার রেখা ধীরে ধীরে মা'র মুখে একটা কালির প্রলেপ টেনে দিয়ে ঘনিয়ে উঠ্‌ল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে তিনি বল্‌লেন—মিনু, তুই তার 'ষ্টুডিও' চিনিস্?

আমি বল্‌লুম—হ্যাঁ চিনি।

মা বল্‌লেন—দুপুরে আজ আমাকে নিয়ে তার 'ষ্টুডিও'তে তোকে যেতে হবে।

আমি বল্‌লুম – আচ্ছা।

আষাঢ় মাসের পনেরো দিন পেরিয়ে গেছে, তবু পৃথিবীর গায়ে এক ফোঁটা জল ঝর্‌ল না। বন্ধ্যা প্রকৃতির

পাঁকের ফুল

চেহারাটা তৃষ্ণায় যেন চৌ-চির হ'য়ে ফেটে পড়েছে। তাপমান যন্ত্রে এবার কল্‌কাতার উত্তাপ ১০৯ ডিগ্রি। রাস্তা-ঘাট প্রায় রাত্রির মতোই নির্জ্জন। সেই নির্জ্জন রাস্তা-ঘাটের ওপরেই শুভ্র রৌদ্রের হাসির টুক্‌রোগুলো জ্বল্‌ছিল রুদ্র রূপের মশাল জ্বালিয়ে। রূপের নেশা যে ধ্বংসের পথকেও আলো ক'রে চলে, আজকার রৌদ্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ রৌদ্রের দিকে তাকালে চোখ্‌ জ্বালা করে, কিন্তু তবু চোখ্‌ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

রাস্তায় দেখ্‌লুম, একটা মোষের গাড়ীর ওপর একটা ছোট-খাট দুনিয়াকে চাপিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান নিশ্চিন্ত মনে চাবুক চালাচ্ছে। ওপরের চাপে গাড়ীর চাকা, মোষের পা রৌদ্রে-গলা পিচের রাস্তার ওপর ব'সে পড়্‌ছে, সে দিকে আজ আর তার নজর নেই। কারণ সে ঠিকই জানে যে, আগুনের এই প্রাচীর ডিঙিয়ে আধা-জলচর আধা-স্থলচর জীবগুলোর খবরদারী করবার জন্য C.S.P.C.A.র বাবুরা কেউ আজ বেরিয়ে আসবে না। একখানা ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া আমাদের চোখের সাম্‌নেই হুঁচুট খেয়ে মুস্‌ড়ে পড়্‌ল। গাড়ীর ছাদটা খস্‌খসের ভেজা পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। যারা আরামে আছে দুনিয়ার আরামের পান-পাত্র প্রতি-মুহূর্ত্তে তাদেরি মুখের সুমুখে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে, কিন্তু তৃষ্ণায়

পাঁকের ফুল

যাদের বুকের ছাতি ফেটে যায়, এক ফোঁটা জলও তাদের কাছে দুর্লভ।

মাকে নিয়ে শিল্পীর 'ষ্টুডিও'তে ঢুকে' পড়্লুম। দেখি, ইলার পা'র কাছে সে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে আছে। দু'-জনার মুখেই একটা স্বপ্নের নেশা জড়ানো। ইলা আমার বন্ধু। মাস খানেক আগে শিল্পীর সঙ্গে আমিই তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম।

উভয়ে ত্রস্ত হ'য়ে উঠে' বস্তেই মা বল্লেন—মনে করেছিলুম ঘরে তুমি একা আছ, তাই খবর না দিয়ে ঢুকে' পড়েছি, কিছু মনে ক'রো না বাবা। কিন্তু তোমার সঙ্গে একলা যে আমার একটু প্রয়োজন আছে।

ম্যাটিং-এর ওপর ছড়িয়ে-পড়া তুলি কাগজ পেন্সিলগুলো কুড়ুতে কুড়ুতে শিল্পী বল্লে—মিস্ রায়, আজ আর আপনার ছবি নেবার হয়তো সুবিধে হবে না, কাল দুপুরে যদি একবার পা'র ধূলো দেন এখানে। কোন্ পাটুনীর কাঠের নৌকো অন্নপূর্ণার পা'র স্পর্শে নাকি সোণার নৌকোতে পরিণত হ'য়েছিল। এর ভেতর কতটুকু সত্য আছে জানিনে, কিন্তু শিল্পীরা যে আপনাদের পা'র ধূলোর স্পর্শ পেয়েই কাগজের গায়ে সৌন্দর্য্যের সোনা

ঝরায়, তার খবর আমি জানি। চলুন আপনাকে গাড়ীতে তুলে' দিয়ে আসি।

ইলা আমার দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাকে চুপি চুপি বললুম—মা ফিরে' চলো। দুঃখ যা পেয়েছি তাই ঢের, এর পর আর অপমান কুড়িও না।

ধীরে ধীরে আমার মুখের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মা বললেন—অপমান যদি অদৃষ্টে লেখাই থাকে মিনু, আমি এড়াতে চাইলেও তো তাকে এড়াতে পারব না। তুই বরং তার চেয়ে গাড়ীতে গিয়ে বোস, আমি এদিককার বোঝা-পড়াটা শেষ ক'রে নিয়েই ফিরে' আসছি।

গাড়ীতে কতক্ষণ ব'সে ছিলুম মনে নেই। হঠাৎ চেয়ে দেখি, সফার মাকে গাড়ীর দরজা খুলে' দিচ্ছে। দুর্দ্দিনের ভারি জমাট কান্না-ভরা মেঘে তাঁর সবটা মুখ আচ্ছন্ন।

* *
*

* *
*

মা গো মা, কি অসহ্য গুমোট! বুকের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এ কি ঘোলাটে থম্-থমে পাংশুবর্ণ মেঘের গাদায় ভ'রে গেছে! দু' ফোঁটা জল ঝরে না! এই মুহূর্ত্তে বাষ্পের বেগে বুকটা ফেটে যদি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায় - বেশ হয়। •

হঠাৎ কিসের লোভে এই লবণ-সমুদ্রের মাঝখানটায় যে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, আজ ভেবেও তার কোনো কারণ খুঁজে' পাচ্ছিনে। তখন যে জিনিষটা মুগ্ধ ক'রেছিল, আজ দেখ্‌ছি সেটা তো ক্লেদে কাদায় ভরা—বীভৎস—কুৎসিৎ। দেহে তার যে আলো জ্বল্‌ছে, সে আলো তো সর্ব্বনাশের আলো—সে আলোতেও মানুষের মন ভোলায়!

চিরকাল মনে মনে Culture-এর একটা গর্ব্ব ক'রে এসেছি, কিন্তু সে গর্ব্ব আমার কোথায় রইল!

আজ তার ভেতরের অজস্র বৈষম্যের দিকে নজর পড়ছে আর নিজের পায়ে নিজের হৃদপিণ্ডটা থেঁৎলিয়ে গুঁড়ো ক'রে ফেলবার জন্য মন মাতাল হ'য়ে উঠছে! আশ্চর্য্য হচ্ছি, এগুলো এর আগে আমাকে ঘা দিতে পারে নি কেন! তার উচ্চ হাস্য, তার কথা, তার গান, এমন কি তার শিল্প রচনা—এ সমস্তর ভেতর দিয়ে যে একটা বীভৎস বর্ব্বরতার ইঙ্গিত সঙ্গীনের মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো লুকোবার জিনিষ নয়। মানুষের সহজ সামাজিক আবেষ্টনের ভেতর দিয়ে যে Culture গ'ড়ে ওঠে, তার চলা-ফেরা, তার আকার-ইঙ্গিতের ভেতর তারও তো কোনো দাবী ছিল না। তবু সে আমাকে জয় ক'রে নিলে—এক নিমিষের জন্য ভাবতেও দিলে না কোথায় নিয়ে চলেছে—কিসের উদ্দেশ্যে! যার ছদ্মবেশ ধরা যায় না, সে যদি এসে ভুলের পথে টেনে নিয়ে যায়, সে হয়তো সহ্য হয়। কিন্তু এ আমি কি ক'রে সহ্য করব?

ঘরের ভেতর মনের গাঢ় অন্ধকারটাকেই চোখের সামনে বিছিয়ে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি, মা এসে বললেন—মিনু, ওর সঙ্গে আমার সে-দিন যে কথাগুলো হ'য়েছিল তা তোর শোনা দরকার।

মা হয়তো ভাবছেন, তার মোহের নাগপাশটা এখনো

আমার কাটে নি, তাই তার ধ্বংসের জন্য শেষ-অস্ত্র এই গরুড় বাণটাই নিক্ষেপ করতে হবে! আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম—কিচ্ছু দরকার নেই মা। আমি সেদিন তোমার মুখ দেখেই সব কথা বুঝে' নিয়েছি।

মা বল্লেন—কিছুই বুঝিস্ নি তুই। মানুষের স্পর্দ্ধা তার হৃদয়হীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে মিশে' যখন ভাষা পায়, সে যে কত বড় বীভৎস ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়, দাড়িয়ে না শুন্লে তার ধারণা করা অসম্ভব। সে বর্ব্বরতার ছবি আমি হয়তো হুবহু আঁকতে পারব না—তবু শোন্।—

তোকে তো ঘর থেকে বা'র ক'রে দিলুম, দিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় সে ঘরে ঢুকে'ই বল্লে—এইবার কি চান আপনারা আমার কাছে বলুন।

আমি বল্লুম—তোমার কাছে এসেছি বাবা, মিনতির বিয়ের দিনটা স্থির ক'রে ফেল্‌বার জন্য। আর তো দেরী করা চলে না।

সে বল্লে—তার জন্য রৌদ্রের এই অগ্নি-দাহ মাথায় নিয়ে এখানে আস্‌বার তো কোনই প্রয়োজন ছিল না আপনাদের।

আমি বল্লুম—কিন্তু তোমার সুবিধে যে কবে হবে সে কথার তো কিছুই আমাকে জানাও নি।

সে বল্‌লে—আমার সুবিধে অসুবিধেতে কি আসে যায় আপনাদের? বিয়ে হবে আপনার মেয়ের, আমার নয়।

তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতো বিস্মিত বিহ্বল চোখ্‌ তুলে' তার মুখের পানে চাইতেই সে আবার বল্‌লে—আমার সঙ্গে যদি তার বিয়ে দেবার কল্পনা আপনারা ক'রে থাকেন, সে ইচ্ছা আপনাদের পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। আমি চিরকুমার থাক্‌বার ব্রত নিয়েছি।

আমি বল্‌লুম—কিন্তু আমার মেয়ে যে কুমারী, সে কথাটাই বা তুমি তবে ভুলে' গেলে কেন? তুমি তাকে বিয়ে কর্‌বে এই প্রতিশ্রুতি দিতেই তো আমি তোমার সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশায় কোনো রকমের বাধার সৃষ্টি করি নি।

সে বল্‌লে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম কি না মনে নেই। দিয়ে থাক্‌লে ভুল করেছিলুম। তা ছাড়া তখন যে তাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন ছিল। শিল্পীর ধর্ম্ম অনেকটা প্রজাপতির ধর্ম্মের মতো। ফুলের বুক থেকে সে তার শোভা-সৌন্দর্য্যই তো চয়ন ক'রে নেয়—ফুলের ভাণ্ডারে কোথায় কতটুকু হানি হ'লো তার দিকে তো তার তাকাবার অবসর নেই। মানুষের ভেতরের এই ফুলগুলোকে মালার মতো গলায় জড়িয়ে নিয়েই শিল্পী তার কলা-লক্ষ্মীর জন্য সৌন্দর্য্য-

লোকের স্বপ্ন রচনা করে। তারপর যদি কোনো ফুলের সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, মালা থেকে সে তো ঝ'রে পড়্‌বেই।

ছ'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মাকে বল্লুম—থামো মা, থামো—আর আমি শুনতে চাইনে।

ধীরে ধীরে আমার মাথাটা তাঁর কোলের ওপর তুলে' নিয়ে মা বল্‌লেন—কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে মা, আমার মেয়েকে সে কিসের জোরে জয় ক'রে নিলে!

মা'র বুকের ভেতরে মুখ লুকিয়ে ভাঙা গলায় বল্লুম—মা, সর্ব্বনাশের Siren যখন কানের কাছে বাঁশী বাজাতে থাকে, মানুষের উচ্ছৃঙ্খল মন তো এমনি ক'রেই তার হাতে ধরা দেয়। আগুনের আঁচের স্পর্শ পাখার ওপর লাভ ক'রেও তো পতঙ্গ ফির্‌তে পারে না। আমার ভেতর দুর্ব্বলতার যে কুশ্রী ক্লেদটা জ'মে ছিল, তার উচ্ছৃঙ্খলতার সবল কীট-গুলো তারি ভেতর বাসা বেঁধে শক্তি সঞ্চয় করেছে। সাবধান হ'তে পারি নি, তাই এ কদর্য্যতার গ্লানির হাত হ'তেও আমার মুক্তি হ'লো না।

মুখটা বুকের ভেতর চেপে ধ'রে রেখে, আস্তে আস্তে চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মা বল্‌লেন—সমীরের কিছু খবর রাখিস্ মিনু—সে কোথায় আছে?

পাঁকের ফুল

মা'র কোলের ভেতর হ'তে দেহটা তুলে' নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মাকে বল্লুম—আমি জানিনে মা, তুমিও জান্তে চেষ্টা ক'রো না। এই বিশ্রী নোংরা পাঁকের ভেতর যদি তাঁকে টান্তে চেষ্টা করো, আমি আত্মহত্যা করব।

মাকে তো বল্লুম—কিন্তু সেই একটি লোকের কথাই তো আজ দুলে' উঠ্‌ছে আমার চিত্তকে মথিত ক'রে আমার সমস্ত চিন্তার ভেতর। আনন্দের আলোকের দিনে দেবতাকে ভুলে' থাকা যায়, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে দুঃখের বজ্র যখন গর্জ্জাতে থাকে তখন দেবতার কথাই তো সকলের আগে মনে পড়ে।

জীবনের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে ঘৃণ্য দুর্ব্বলতাকে জয় কর্‌তে পারিনি, কিন্তু এ দুর্ব্বলতাকে জয় করব। আলোকের ভেতর যদি দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে থাকি, অন্ধকারের ভেতরেও তাঁকে টেনে আন্‌তে চেষ্টা করব না।

* *
*

* *
*

ওরে আমার বাছা, ওরে আমার মাণিক, তোর নাম আমি রাখ্লুম পঙ্কজ। যখন অনাগত ছিলি, অথচ তোর আসার সম্ভাবনায় সমস্ত দেহ-মন ভ'রে উঠেছিল, সে দিন কেউ তোকে চায় নি, আমিও তোকে প্রাণপণেই ঠেকিয়ে রাখ্তে চেয়েছিলুম। সেদিন তোর আহ্বানের মন্ত্র ছিল অশ্রু আর অভিশাপ। কাদায় যার সমস্ত রাস্তা ভরা, মিথ্যার ভেতর দিয়ে যার উদ্ভব, গ্লানি আর কুণ্ঠা ছাড়া সে যে আর কিছু দিতে পারে, সে কথা তো একবারও মনে হয় নি।

কিন্তু যখন তুই এলি—এ কি অমৃতে সমস্ত মন ভ'রে গেল! কোথায় রইল গ্লানি, আর কোথায় রইল তোর মা'র সঞ্চিত পুঞ্জিত পাপের বোঝা! সব হাল্‌কা ক'রে দিয়ে, পঙ্কের সমস্ত দীনতাকে জয় ক'রেই তুই যে ফুটে' উঠেছিস্ অম্লান সৌন্দর্য্যে তোর মা'র অন্তর-সরোবরের মাঝখানটাতে। দুর্গন্ধ দুষ্ট ক্লেদের ভেতর থেকে পদ্ম যে কেমন ক'রে অত শুভ্র সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটে' ওঠে তার রহস্য তোকে পাবার আগে বুঝ্‌তে পারি নি। তোকে পেয়ে তবে আজ তা আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কি গভীর পাঁক জ'মে রয়েছে আমার দেহের শিরায় শিরায়, মনের আনাচে-কানাচে! আমার সেই সমুদ্রের মতো অপার অগাধ পাঁককে নির্ম্মল শুচিতায় ভ'রে দিয়ে আজ তুই চোখ্ মেলেছিস্, তাই তো তোর নাম রাখ্‌লুম পঙ্কজ।

তোকে পাবার আগে প্রতিদিন মনে হয়েছে—যে পথ মৃত্যুর দরিয়ার দিকে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে, সে পথ ফুরোয় না কেন? আজ মনে হচ্ছে পথটা আর একটু বেড়ে গেলেও মন্দ হ'তো না। তা হ'লে হয়তো তোকে ফুটিয়ে তুলে' রেখে যাবার অবকাশ পেতুম। কিন্তু সে তো আর হয় না—প্রতি মুহূর্ত্তে পরপারের আহ্বান আমার

পাঁকের ফুল

চোখের সাম্‌নে আলোর ভেতর অন্ধকারের জাল রচনা ক'রে চলেছে। এই দণ্ডেই মৃত্যুর দূত যদি এসে বলে— তাঁবু তোল, যাত্রার বোঝা ঘাড়ে নাও, তাতেও আমি বিস্মিত হ'বো না।

এত দিন আপনার ভাবনা নিয়েই মত্ত হ'য়ে ছিলুম, কিন্তু আজ নিজের কথা আর এতটুকুও মনে আস্‌ছে না। আজ আমার সব ভাবনা হারিয়ে গেছে একা তোর ভাবনার মাঝখানে। যাবার সময় তো ঘনিয়ে এলো, কিন্তু ওরে আমার মূক মৌন অসহায় মেয়ে, তোকে কার কাছে রেখে যাবো, কে তোকে স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে, মায়া দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌বে? জানি, আমার মা'র কাছে তোর আদর-যত্নের অভাব হবে না। কিন্তু এ কথাও জানি, তিনি তোকে প্রসন্ন হাসির সঙ্গেও কখনো গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বেন না। যে তাঁর মেয়ের মাথার ওপর দুঃসহ কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে সে তো তাঁর মনকে কাঁটার খোঁচার মতো ক'রেই বিঁধ্‌বে। কিন্তু ফুলকে যে ফুটিয়ে তোলে, আদর-যত্নের চেয় বড় জিনিষ তাকে দিতে হয়। মাটির মনের রসেই বসন্তের মুখে হাসির রেখা ফুটে' ওঠে—তার বুকে পরিপূর্ণ বিকাশের প্লাবন জাগে!

আজ আবার নতুন ক'রে সমীর-দা'র কথা মনে পড়্‌ছে।

মানুষের মনের পশু যখন জাগে, তখন সুমুখের আলোর দীপ্তিটাও তার চোখে পড়ে না। ভুল যে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, সমীর-দা' হয়তো তা বুঝতেন। তাই পঙ্কের ওপরে তাঁর কোনো লোভ না থাকলেও, পঙ্কজকে তিনি হয়তো উপেক্ষা করতে পারতেন না। ফিরে এসো সমীর-দা', তুমি ফিরে' এসো। এ জীবনে যে ভার নামাতে পারলুম না, অজানা পথ-যাত্রায় সেই ভারটা অন্ততঃ একটু হালকা ক'রে দাও ভাই—আমি বেরিয়ে পড়ি।

*   *
*

* *
*

ডায়েরীর পাতাগুলো এইখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু সে যা বেদনার অশ্রু ঝরিয়ে গেল, তার তো শেষ নেই। মিনতিকে পাই নি, সে যে আমার কত বড় বেদনা তা আমিই জানি। তবু তাকে পেয়ে যে তাকে বঞ্চিত করি নি সেইটেই ছিল আমার পরম গর্ব্ব—সুগভীর সান্ত্বনা। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, জোর ক'রে তাকে লাভ কর্‌বার চেষ্টা করি নি কেন? এতদিন পরে আজ মনের ভেতর স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে—কেবলমাত্র ভালোবাসাতেই প্রেম সার্থক হয়

না—প্রেমাস্পদকে প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করাও প্রেমের ধর্ম্ম। এই মুহূর্ত্তে যদি সেই কাপুরুষটাকে হাতের কাছে পেতুম!

মিনতির আহ্বান আমার কাছে বেলা-তটের ওপর সমুদ্র যেমন ক'রে কেঁদে ফেটে লুটিয়ে পড়ে তেমনি ক'রে লুটিয়ে পড়্তে লাগ্ল। কাগজগুলো গুটিয়ে বুকের পকেটে ফেলে পথে বেরিয়ে পড়্লুম। পা'র তলায় তো বিদ্যুতের গতিকে টেনে দিয়েছি, তবু পথ ফুরোয় না কেন?……

চোখের সাম্নে জেগে আছে সৃষ্টি-প্রভাতের প্রথম পদ্মটির মতো মিনুর মুখ—সৌন্দর্য্যের বন্যায় ভরা—লাবণ্যের প্রভায় অপরূপ! প্রভাতের রূপ বদ্‌লে গেছে, আকাশের বুক প্রলয় ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে স্তম্ভিত। সমুদ্র তারি তালে তালে ক্ষ্যাপার মতো অসম্বৃত স্পর্দ্ধায় দুল্‌ছে। পৃথিবী কাঁপ্‌ছে—তারা খস্‌ছে, কেবল স্থির হ'য়ে আছে সৃজন-প্রভাতের প্রথম পদ্মটি, যার মুখ আমার মিনতির মুখের মতো;—একটি দল তার খসে নি—একটি কেশর তার ঝ'রে পড়ে নি!

পাঁকের ফুল

হঠাৎ চেয়ে দেখি, পায়ের গতি থেমে গেছে মিনুদের বাড়ীর সম্মুখে—আঠারো বৎসরের পরিচিত সেই পথটার মাঝখানে! মানুষ ভোলে, কিন্তু মানুষের পা তার চিরন্তনের অভ্যাস ভুল্‌তে পারে না।

ভেতরে ঢুকে' চিরদিনের পরিচিত ঘরটার সাম্‌নে দাঁড়াতেই শুন্‌তে পেলুম, ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠে মিনতি বল্‌ছে—রীতি, দেখ্‌তো ভাই, বাইরে কার পা'র শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ও শব্দ যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের চেনা।

ভেতর হ'তে রীতি বললে—ও কিছু নয় দিদি, তুই একটু ঘুমো।

মিনতি বল্‌লে—না রে তুই বুঝ্‌তে পারছিস্‌নে—আমি ঠিক চিনেছি, ও আমার সমীর-দা'র পা'র শব্দ।

ওরে অভাগী, আমার পা'র শব্দটাকেও এমন ক'রে চিনে রেখেছিস্! চোখ্ ফেটে জলের ঝর্‌ণা নেমে এলো। কোনো রকমে তাকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে, মুখে একটু হাসির রেখা টেনে ঘরে ঢুকে' বল্‌লুম—হাঁ মিনু, তোমার সমীর-দা'ই বটে। তার পা'র শব্দটাকে আজও ভুলে' যাও নি ভাই?

পাঁকের ফুল

রীতি ধীরে ধীরে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল। মিনতির হাত দু'টো হাতের ভেতর টেনে নিয়ে আমি তার মাথার কাছে ব'সে পড়লুম।

মিনতি বল্‌লে—ওখানে নয় সমীর-দা, এইখানটায় স'রে ব'সো, আমি তোমার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

স'রে এসে পাশে বস্‌তেই তার হাত দু'টো আমার হাতের ভেতর ছেড়ে দিয়ে সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইল। তার দেহের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটা একেবারে হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল। পরিপূর্ণ নিটোল দেহটা ভেঙ্গে টোল খেয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। গোলাপফুলের পাপ্‌ড়িগুলো দেহের বোঁটা থেকে ঝ'রে প'ড়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে তার চিহ্নটুকুও নেই। 'কূলে কূলে ভরা চোখের কোণ কোটরের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। সেখানে একটা অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বলতা চক্ চক্ করছে। কেবল মুখের দীপ্তিটা এখনও নিভে যায় নি। প্রভাতের শুকতারাটা ভোরের আকাশে যেমন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলতে থাকে, তার মুখের ভেতরেও তেমনি একটা ঝ'রে-পড়ার দীপ্তি প্রাণের শেষ রক্তটুকু দিয়েই যেন দীপ জ্বালিয়ে জেগে আছে।

মিনতি আমার কথার জের টেনে বল্‌লে—পা'র শব্দটা মনে আছে দেখে বিস্মিত হচ্ছ সমীর-দা! কিন্তু বিস্মিত হবার তো কোনো কারণ নেই। মনটাকে যদি খুঁজে' দেখো দেখ্‌তে পাবে, তার ভেতর থেকে এক ফোঁটা জিনিষও তোমার হারিয়ে যায় নি। এই মনটাকে খুঁজে' দেখি নি ব'লেই তো আমি নিজেও জ্বল্‌লুম, তোমাকেও জ্বালিয়ে গেলুম। তোমার বুকে যে কি দাগা দিয়েছি তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝ্‌তে পারছি। তবু তোমাকে যে দুঃখ দিয়ে গেলুম, জানি, সে দুঃখ তোমার একদিন ঘুচ্‌বেই। কিন্তু আমার বুকের ওপরে যে পাথরের বোঝা নিয়ে গেলুম, সে বোঝা আমার ইহকালে তো ঘুচ্‌লোই না, পরলোকেও ঘুচ্‌বে কি না কে জানে!

যে ঝরণাটাকে বাইরে রোধ ক'রে এসেছিলুম সে ঝরণাকে আর রোধ করতে পারলুম না, ঝর্ ঝর্ ক'রে তা মিনতির হাতের ওপরেই ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ধারার স্পর্শ পেলে যূথীর দলগুলো যেমন হঠাৎ আচম্‌কা ফুটে' ওঠে, তেমনি একটু মিষ্টি হেসে মিনু বল্‌লে—ছিঃ সমীর-দা, আমার যাওয়ার পথটাকে

আর ভিজিয়ে দিও না ভাই। যে শক্তি নিয়ে মানুষ পিছল পথে পা বাড়ায় সে শক্তি যে আমার নিঃশেষেই নষ্ট হ'য়ে গেছে।

অসম্বৃতের মতো সেই অদ্ভুত অপূর্ব্ব হাসিটির ওপর উত্তপ্ত ব্যগ্র ঠোঁটের একটা স্পর্শ ঢেলে দিয়ে বললুম—তোমার তো যাওয়া হবে না মিনু! একলা এখানকার মরুভূমিতে এত শুষ্ক নীরস মন নিয়ে আর আমি থাকতে পারব না। দেখছ তো বিনা রোগেই তোমার সমীর দা কেমন শুকিয়ে উঠেছে!

তার চোখের সেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপর ফেলে মিনু বললে—পাঁকের ভেতর যে ফুল ঝ'রে পড়ে তা দিয়ে তো কখনো দেবতার পূজা হয় না। একটু আগে যে স্পর্শটা তুমি আমার ক্লেদ-ক্লিন্ন অধরের ওপর ঢেলে দিয়েছ সেই আমার ঢের। আমার পরপারের অন্ধকার পথ তারি আলোকে আলোময় হ'য়ে উঠেছে। এর বেশী আমিও চাইনে, তুমিও চেয়ো না সমীর-দা।

শীর্ণ দেহটাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললুম—কাদা হয় তো কিছু তোমার গায়ে লেগেছিল মিনু, কিন্তু কাদা তো অত্যন্ত ক্ষণিকের জিনিষ। সে কাদা

তো কবে ধুয়ে' মুছে' নিশ্চিহ্ন হ'য়ে উঠে' গেছে। তা ছাড়া সোনার ভেতরের খাদকেই যদি শুধ্‌রে নিতে না পার্‌বে তবে প্রেমের আগুন রয়েছে কেন?

ধীরে ধীরে আমার আলিঙ্গনের ভেতর থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে নিয়ে মিনতি বল্‌লে—তা হয় না সমীর-দা, পাঁককে পরিষ্কার কর্‌তে গেলে সে যে পরিষ্কার জলকেও ঘোলা ক'রে তোলে। দিনও তো আমার ফুরিয়ে এসেছে ভাই। ঐ শোনো, বাঁশীতেও আজ বিদায়ের সুরই বাজ্‌ছে। মিলনের কোনো রাগিণীই তো এর সঙ্গে খাপ খাবে না।

তারপর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে প'ড়ে থেকে তার শুভ্র শীর্ণায়মান হাত দু'টোর ভেতর আমার হাত দু'টোকে টেনে নিয়ে সে আবার বল্‌লে—পৃথিবীর আলো আমার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে সমীর-দা। আমি যেতে চাই—কিন্তু যেতে পার্‌ছিনে।—কেন জানো? পিছন থেকে আমাকে টান্‌ছে আমার ঐ নাম-গোত্রহীন মেয়েটা। তার ভার তুমি নাও ভাই, নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। পাঁকের ভেতর সে জন্মেছে বটে, কিন্তু পাঁকেই তো পঙ্কজও জন্মে। ঐ দোলার ভেতর সে ঘুমিয়ে আছে। তার দিকে

চেয়ে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, তার মা'র গ্লানি তার দেহকে এতটুকু স্পর্শ কর্‌তে পারে নি।

আস্তে আস্তে মিনতির মাথাটা বালিশের ওপর নামিয়ে দিয়ে দোলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখ্‌তে পেলুম, একটা রক্ত-মাংসের শতদল, শুভ্র শয্যার বুকটা আলো ক'রে ফুটে' রয়েছে। দুর্যোগ রাত্রির পরে ভোরের মুখে যে হাসিটি ফুটে' ওঠে, তার মুখেও তেমনি একটি স্নিগ্ধ হাসির রেখা। ঘুমন্ত শিশুটিকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বল্‌লুম—এ যে একেবারে তোমার ছেলেবেলার চেহারাটাকেই ফিরিয়ে এনেছ মিনু!

ম্লান হেসে মিনতি বল্‌লে—আশীর্ব্বাদ করো সমীর দা, আমার মতো দুর্ভাগিনী না হয়। ওকে তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। ওর রক্তের ভেতর যে দোষটা থাক্‌ল, তোমার হাতের স্পর্শে তার গ্লানিটাও যেন ওর ঘুচে' যায়।

পঙ্কজকে কোলে নিয়ে মিনতির কাছে ফিরে এসে বল্‌লুম—তোমার আমার জন্য না চাও, এই নিষ্কলঙ্ক শিশুটির মুখের দিকে চেয়ে, দু'দিনের জন্য হোক্, এক দিনের জন্য হোক্ তুমি আমার ঘরে চলো। একে এমন ক'রে নাম-গোত্রহীন ক'রে রেখে যেও না ভাই!

মিনতির তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টির ভেতর হঠাৎ যেন একটু বিহ্বলতার আমেজ জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরেই দেখি, তার চোখে আগুনের মতো সেই আলোটা আবার ফিরে এসেছে, যার সাম্‌নে কোনো অন্ধকারই টিক্‌তে পারে না। সেই দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌লে—মিথ্যার দ্বারা ওর মায়ের কলঙ্ক ঢেকে ওকে সুখী কর্‌তে পার্‌বে না সমীর-দা! তার চেয়ে ও যা ওকেও তা জান্‌তে দিও, জগৎকেও তা জান্‌তে দিও। দুঃখের আগুনে পুড়ে'ই যে মানুষ সোনা হয়, তার পরিচয় আমার এই জীবনেই আমি পেয়েছি।

মিনতির চোখের আগুন তখন আমার বুকের ভেতরেও আলোর রেখা এঁকে দিয়েছে। সে আলোকে সত্যের রূপটা আমার চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে' উঠ্‌তেই আমি বল্‌লুম—বেশ তাই হবে মিনু। যে দুঃখের বজ্র বুকে নিয়ে তুমি সত্যকে লাভ করেছ, তার গৌরব হ'তে তোমার মেয়েকেও আমি বঞ্চিত কর্‌ব না। মানুষের জীবনে যে-দুর্ব্বলতা প্রতিদিনকার ঘটনা, তাকে গোপন ক'রে অনেক অনাচার সমাজের ভেতর বেড়ে উঠেছে। তোমার মেয়েকে দিয়েই যদি তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ কর্‌তে চাও, আমি তাকে সেই যুদ্ধের উপযোগী

ক'রেই গ'ড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ভাই, ওর ভার আমি নিলুম।

চেয়ে দেখি মিনতির মুখ একটা আকস্মিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। সে দীপ্তিতে ঝরার গানের কথাই লেখা, কিন্তু সে ঝরার গানের ভেতর হ'তে বেদনার রেখাটাও নিঃশেষে মুছে' গেছে।

* *
*

* *
*

এর কয়েক দিন পরে নীতীশ তার বন্ধু সমীরের কাছে থেকে যে চিঠি পেলে তাতে লেখা ছিল—

এইমাত্র মিনতির শ্মশান থেকে ফিরে আসছি, কাপড়ও বদলানো হয় নি। টেবিলের ওপর আমার টোটা-ভরা রিভলভারটা প'ড়ে আছে অদৃশ্য আগুনের তড়িৎ স্পর্শটাকে ধূমায়িত ক'রে তোলবার জন্য। তোমার শিল্পী-বন্ধুকে সাবধান ক'রে দিও। তাকে ব'লো—সমীর সেন বিলাতে গিয়ে লেখাপড়া যতটুকু শিখে' এসেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ক'রে শিখে' এসেছে জানোয়ারকে শায়েস্তা করতে। পশুর চেয়ে বড় জানোয়ার যে মানুষের মধ্যেই আছে সে কথা তোমার এই বন্ধুটি যেমন জানে আর কেউ তেমন জানে না।

আল্পসের গুহায়, অফ্রিকার বনে-জঙ্গলে বড় বড় শিকারীদের হাত হ'তে বন্দুক যখন খ'সে পড়েছে—যার 'তাক' তখনো ব্যর্থ হয়নি, সেই আবার নতুন ধরণের পশুর রক্ত-লোলুপতায় মেতে উঠেছে। আমার রিভল্‌-ভারটি তার তারাহীন চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি হেনে বল্‌ছে, 'তাক' আমার এবারেও ব্যর্থ হবে না।

আমার এ চিঠির মর্ম্ম তুমি বুঝ্‌বে কি না জানিনে, কিন্তু তোমার বন্ধুর কাছে এর অর্থ ধরা পড়্‌তে একটুও দেরী হবে না। তাকে ব'লো, মিনতির মেয়েকে নিয়ে আমি বিলেতে চল্‌লুম। যোগাড়-যন্ত্র ক'রে বেরিয়ে পড়্‌তে যে ক'দিন দরকার, জীবনের প্রতি যদি তার মায়া থাকে তবে সে ক'দিনের ভেতর যেন আমার চোখের সাম্‌নে তার ছায়াটাও ধরা না প'ড়ে।

চিঠি পেয়ে নীতীশ বিহ্বলের মতো খানিকক্ষণ ব'সে রইল। তারপর নিজের মনে মনেই বল্‌লে—সমীরের মাথাটা দেখ্‌ছি একেবারেই বিগ্‌ড়ে গেছে!

চেনা-অচেনা

চেনা-অচেনা

মোটর কলিসনে 'কলার-বোন্' ভেঙে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে প'ড়ে ছিলুম।

মন্দ লাগ্‌ছিল না। একঘেয়ে জীবনের ভেতর যে ফাঁকেই একটু বৈচিত্র্য দেখা দেয়, তার ভেতর দিয়েই প্রাণে একটা দোলা জাগে, অবশ্য যাদের প্রাণ একেবারে মিইয়ে যায়নি তাদের। বেঁচে আছে অথচ প্রাণ নেই দুনিয়ায় এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প নয়।

প্রকাণ্ড হল্—লোহার খাটিয়া একটির পর একটি ক'রে সাজানো। এই ময়ুর-সিংহাসনগুলো আলো ক'রে প'ড়ে ছিলুম, আমি এবং আমারই মতো আরো গুটিকত লোক

যাদের খবরদারী কর্‌বার কেউ নেই, অথবা খবরদারী কর্‌বার লোক থাক্‌লেও অর্থ নেই সুতরাং সামর্থ্যও নেই।

কেউ কাশ্‌ছে, কেউ কাৎরাচ্ছে, কেউ পাশের সঙ্গীদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের আলাপ কর্‌ছে। একটা লোক তার অব্যক্ত ব্যথার যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে না পেরেই হয়তো গুম্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল। কিন্তু এই কান্নার জেরটাও সে বেশীক্ষণ টেনে চল্‌তে পার্‌লে না। একটা নার্সের হৃদয়হীন শুষ্ক ধমকে কান্নাটা তার ফল্গুর জল-ধারার মতো খানিকটা জল ছেড়ে দিয়ে যেমন অকস্মাৎ জেগে উঠেছিল, তেমনি অকস্মাৎ বুকের কোন্ একটা কোণেই অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

এমন রোজ্‌সাই হয়। কারণে অকারণে নার্সগুলোর মুখ তো চলেই—সময়ে সময়ে হাতও যে না চলে তাও নয়। যখন হাসপাতালের বাইরে ছিলুম তখন নার্সগুলোর সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল নির্ব্বাক বিস্ময়ের। ভাব্‌তুম, এদের জীবনই সার্থক। দিনের পর দিন এরা আলো জ্বালিয়ে রেখেছে তাদেরি অন্ধকার পথে, যারা মৃত্যুর সাথে একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের যেখানে দু'দণ্ডের বেশী রোগীর ঘরে ব'সে থাক্‌তে মন হাঁপিয়ে ওঠে, সেখানে এরা কেবল হাজার হাজার রোগীর খবরদারীই করে না, সেবার ভেতর

দিয়ে তাদের মুখে হয়তো আনন্দের হাসিটেও ফুটিয়ে তোলে।
এই অফুরন্ত আনন্দের উৎস-ধারা এরা কোথায় পায়!

কিন্তু হাসপাতালে ঢুকতেই তাদের যে রূপটা চোখে পড়ল, তাতে ভুল তো ভাঙলই, ভুল যে হ'য়েছিল তার জন্যেও মনের ভেতর অনুশোচনার অন্ত রইল না। দেখ্‌লুম এখানেও চল্‌ছে রীতিমত ব্যবসাদারীর বেসাতি। ফুল দাও, ফল দাও, মুখের ক্রিম, গন্ধের এসেন্স দাও, মিষ্টি হাসির পুরস্কার হয়তো একটু পাবে—না দাও রাস্তার পাশে প'ড়ে থাক্‌লে যে সোয়াস্তিটুকু তুমি পেতে, এদের দোরের কাছে মাথা খুঁড়ে' মর্‌লেও সে সোয়াস্তিটুকু হয়তো তোমার অদৃষ্টে ঘট্‌বে না।

চোখের সাম্‌নে রহস্যপুরীর আগল খু'লে' গেছে। দুদিনেই এদের জীবনগুলো পড়া পুঁথির মতো পুরানো হ'য়ে গেল। এদের কেউ শ্বেতপদ্ম, রক্তগোলাপ বা চন্দ্রমল্লিকা নয়, এমন কি যুঁই-জেস্‌মিনও নয়—সব কাঠ-মল্লিকার দল। মেজে ঘ'সে বাইরের জলুস হয়তো একটু চক্‌চকে ক'রে তুলেছে, কিন্তু কুড়িয়ে নেবার মতো বেসাত এদের ভেতর এতটুকুও নেই।

হাল ছেড়ে দিয়েছি, হঠাৎ এমনি সময় একদিন চম্‌কে উঠ্‌লুম এদেরি একজনকে দেখে। 'ডিউটি' বদ্‌লে গেছ্‌ল।

পাঁকের ফুল

রাত্রের অন্ধকারে নার্সটা এসে দাঁড়ালো— জ্যোৎস্নার আলো-ছায়ার রহস্যালোকে ঘেরা অজানার রাজ্যটাকে তার পেছনে নিয়ে। তার চোখ, মুখ, চুলের ডগা -সব জায়গা দিয়েই যেন একটা দীপ্তি ঝরে। প্রত্যেক রোগীর শয্যার পাশটাতে সঞ্চারিণী দীপ-শিখার মতো সে ঘুরে বেড়ায়। সেবায় তার শ্রান্তি নেই— দ্বিধা নেই— বিরক্তিও নেই।

কিন্তু তার সেবা, তার দীপ্তির চাইতেও আমার মন ভুলালো তার চার পাশে ঘেরা ছোঁয়াচে অতীত যে রহস্যের মায়াপুরীটা সে গ'ড়ে তুলেছে সেই মায়াপুরীর রূপটা। দেহের দুয়ার ঘিরে এই যে রহস্যের যবনিকা এই যবনিকার অন্তরালের মোহই তো যুগে যুগে মানুষকে সোণার হরিণের লোভ দেখিয়েছে— মরীচিকার মায়ায় মরুর পাথারে পথিকের পথ ভুলিয়েছে।

* *
*

* *
*

প'ড়ে প'ড়ে দু'পাশের লোকগুলোর দুঃখের কাহিনী শুনছিলুম। কোনো নতুনত্ব নেই। সমস্তই সাধারণ বাঙালী ঘরের দৈনন্দিন দৈন্য ও নিরাশার কাহিনী। বাড়ীতে থাবার লোকের অভাব নেই, অথচ উপার্জ্জন করবার লোকের অভাব পুরামাত্রায় আছে। খেটে খেটে এবং পেট ভ'রে খেতে না পেয়েই কেউ হয়তো ম্যালেরিয়ায় পড়েছে, আবার কারো স্বাস্থ্য বা জীবন-মধ্যাহ্নেই এমন চিড় খেয়েছে যে, জোড়া লাগবার সম্ভাবনাও এ জন্মের মতো ঘুচে' গেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—এত সব দুঃখ তারা কি ক'রে সহ্য করে।

কেউ কিছু বল্‌বার আগেই শিবু মিস্ত্রি গলা বাড়িয়ে বল্‌লে—এ আর কি দেখ্‌ছেন মশায়, আমাদের দুর্দ্দশার ছবি? আমরা তো দিব্যি আরামে আছি—দু'বেলা যা হোক্ দু'মুঠো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু বাড়ীর কথা ভাব্‌তেও বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়। দু'টো মেয়ে, একটি ছেলে, একটি বিধবা বোন্—তা ছাড়া পরিবারও আছে। মহাজন যে ধার দেওয়া বন্ধ করেছে সে তো আমিই দেখে এসেছি। দোকানীও বোধ হয় এতদিনে তাদের সুমুখে তার দোকানের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। অতগুলো ছেলে-মেয়ে [illegible] দু'টো অসহায় নারী—কি ক'রে যে তাদের চল্‌ছে কে [illegible]? —বল্‌তে বল্‌তে দেখ্‌লুম, তার চোখ্ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌ল।

বালিসের তলা থেকে মণি-ব্যাগটা বে'র ক'রে তার ভেতর হ'তে দু'টো টাকা নিয়ে তার হাতে গুঁজে' দিয়ে বললুম—আজ যখন তোমার স্ত্রী বা আত্মীয়-স্বজন তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে টাকা দু'টো তাদের হাতে দিয়ে ব'লে দিও, ছেলেগুলোর জন্যে যেন ভালো ক'রে দানা-পানির ব্যবস্থা করে।

শিবু দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে আমাকে প্রণাম ক'রে বল্‌লে—বাবু, আর জন্মে বোধ হয় আপনি আমার অতি আপনার জন কেউ ছিলেন—নইলে পথের লোকের প্রতি কে এতখানি দরদ দেখায় ?

মনে মনে ভাব্‌লুম হয়তো তাই হবে।

দূরের একটা কান্নার আওয়াজ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। কান্নাটা কাণে বেজে বুকটাতে খচ্‌ ক'রে বিধ্‌লো। কিন্তু ঐ নার্সগুলো! রোগী ঘেঁটে ঘেঁটে হয়তো ওদের চামড়ায় ঘাটা প'ড়ে গেছে। তাই এত বুক-ভাঙা আর্ত্তনাদও ওদের দেহের চামড়া ভেদ ক'রে মনের তারে ঘা দিতে পারে না।

চারদিকের রোগীর নিশ্বাসে ভরা ... বাতাস নাকের কাছে যেন ভারি হ'য়ে আছে—নিশ্বাস টান্‌তেও সোয়াস্তি পাচ্ছিনে। হঠাৎ কাণের কাছে একটা মিষ্টি আহ্বান শুনে' চম্‌কে উঠ্‌লুম। মুখ তুলে' দেখি—রাত্রের সেই নার্সটা একেবারে আমার খাটের পাশটা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বল্‌লে,—আজ বুঝি তোমার মন ভালো নেই ?

আমি বল্‌লুম—না ভালো নেই। কিন্তু তুমি সে কথা জিজ্ঞাসা করছ যে ?

সে জবাব দিলে—তোমার মুখে প্রতিদিন যে একটা সজীবতার ছাপ থাকে আজ তা খুঁজে' পাওয়া যাচ্ছে না। কি ভাব্‌ছ?

—ভাব্‌ছি অন্যায়ের নিশ্বাস ঘরের বাতাস যখন ভারি ক'রে তোলে, তখন তোমরা সেই ভারি বাতাসে নিশ্বাস ফেলো কি ক'রে?

—অর্থাৎ এ ঘরে আজ ঝড় ব'য়ে এতই ধুলো উড়িয়ে গেছে যে, তোমার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দান-খয়রাতে তো দেখ্‌ছি তুমি একেবারে রকফেলারেরও বড় ভাই। পকেটটাও হয়তো বেশ ভর্ত্তি আছে। তবু একটা ক্যাবিন ভাড়া নিচ্ছ না কেনো বলো তো! তুমি ইচ্ছে ক'রেই তো সেই সব ঝামেলা সহ্য করছ—মনের দুঃখ দেহের দুঃখের চাইতেও অনেক সময় ভারি হ'য়ে দাড়ায়।

হেসে বললুম—অর্থাৎ তুমি আমাকে বিদেশে নির্ব্বাসন দিতে চাও।

বিস্মিত চোখ্‌ দু'টো আমার মুখের পানে মেলে ধ'রে সে বললে—ক্যাবিনে যাওয়াটা তুমি নির্ব্বাসন ব'লে মনে করছ কেন? এই ঘরটাতেই বা তোমার কোন্‌ আত্মীয়-স্বজন আছে শুনি?

—সব—সব। বাংলা দেশটাকে তোমার ভাই-বন্ধুরা

এমন অবস্থাতেই টেনে এনেছে যে, এখানকার লোকেরা এক রকমের দুঃখের ছাপরে ছাপিয়ে এক পরিবারের লোক হ'য়ে উঠেছে। এখানে যে কান্না তোমরা শোনো, বাংলা দেশের এমন বাড়ী নেই যে বাড়ীতে প্রতিদিন তারই অভিনয় না হচ্ছে। ক'টা লোককেই বা বন্দী ক'রে রেখেছ তোমরা তোমাদের এই হাসপাতালে? বাংলা দেশের চারিকোটি লোকই যে কারাগারে বাস করে তা জানো? একই ঘানিতে ঘুরে' আমরা সব আত্মীয় হ'য়ে গেছি। সুতরাং তোমাদের ঐ ভাড়াটে হাতের সেবা নেবার জন্যে ক্যাবিনের Solitary-Imprisonment-এর দুঃখটা না হয় না-ই নিলুম।

নার্সের রহস্যময় চোখ্ দু'টোর ওপর একটা কালো মেঘের ছায়াও যেন ঘনিয়ে এলো। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বল্‌লে—বাবু, তোমার দেশ-প্রেমের আমি নিন্দে করছিনে, কিন্তু আমাদের ওপরেও তুমি সুবিচার করো নি। হাসপাতালে দুঃখ হয়তো তোমাদের ঢের আছে, কিন্তু তোমাদের সে দুঃখ লাঘব কর্‌বার জন্যে যে আমরা চেষ্টা করিনে এমন অপবাদও আমাদের দিও না। যারা সেবার ব্রত গ্রহণ করে, তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে কয়েকটা টাকা তোমরা দাও ব'লে মনে ক'রো না, তারা সব ভাড়াটে

মেয়ের দল। এ হাসপাতালে যতগুলো নার্স আছে, যদি খোঁজ নিয়ে দেখো, দেখ্‌তে পাবে তাদের অনেকেরই জীবনের ইতিহাসে কোথাও না কোথাও এমন দু'টো একটা ফাঁক আছে যা তোমাদের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো জিনিষ দিয়েই পূর্ণ হয় না। আর 'পূর্ণ হয় না ব'লেই তারা রুগ্ন মৃত্যু-পথ-যাত্রীদেরও সঙ্গী ক'রে নিতে দ্বিধা করে নি।

তাকিয়ে দেখ্‌লুম, তার মুখের ওপর একটা করুণ বেদনার পর্দ্দা টানা। কিন্তু সেই পর্দ্দার ভেতর দিয়ে পেছনের আলোর টুকরোগুলোও যেন চোখে পড়ছে। ওর সেবার রূপ অনেকবার তাকিয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর মনের রূপ কখনো চোখে দেখি নি। আজ যেন তারই অভাসটা ঐ পর্দ্দার ছেঁদের আলোকেই একটু স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল।

হঠাৎ কোন্ ফাঁকে হরিশ সর্দ্দারের গোঙ্‌রানীটা যে ঘরের বাতাসে ঘা দিয়েছে আমি তার কিছুই জান্‌তে পারি নি, কিন্তু ওর কাছে তা ধরা পড়্‌তে এক মুহূর্ত্তও যে দেরী হয় নি, একটু বাদে মুখ তুল্‌তেই তারও পরিচয় পেলুম। দেখ্‌লুম সর্দ্দারের ব্যথা-বিকৃত কুৎসিত মুখখানি

টেনে ও একেবারে কোলের কাছে তুলে' নিয়েছে। তার মুখের ওপর থেকে যন্ত্রণার চিহ্নটা তখনও নিঃশেষে মুছে' যায় নি বটে, কিন্তু সন্ধ্যার মেঘে অস্তগামী রৌদ্রের রেখা যেমন আলোর একটা পাড় পড়িয়ে দিয়ে যায়—সর্দ্দারের মুখটা ঘিরে তেমনি একটা আলোর রেখাও চক্ চক্ করছে। ও যখন ঘরে ঢোকে তখন এম্নিই হয়। আস্তাকুঁড়ের এই বিশ্রী কদর্য্য পঙ্কগুলোর ভেতরেও পদ্মদলের দীপ্ত-শ্রী জেগে ওঠে!

* *
*

* *
*

সেদিন অকস্মাৎ আকাশের দিগ্বিদিক্ ঢেকে কষ্টি-পাথরের মতো কালো দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এলো। হাসপাতালের জানালার ভেতর দিয়ে তারই রূপটা স্নিগ্ধ প্রলেপের মতো চোখ্ জুড়িয়ে দিলে। সাদা দেয়ালের বৈচিত্র্যহীন নিঃস্বতা দু'টো চোখের ক্ষুধা এই ক'দিনের ভেতরেই যে কতটা বাড়িয়ে তুলেছে এই মেঘের দিকে চেয়ে আজ তা' আরো ভালো ক'রে বুঝ্তে পারলুম। মেঘের ভেতর উৎসবের দামামা বাজ্ছে---আকাশের বুক চিরে দিয়ে চলেছে বিজ্লী রূপসীদের চোখ্ ঝল-সানো উন্মাদ নৃত্য।

পথের কাঁকর উড়িয়ে, দরজা-জানালার কপাটগুলোর ওপর ঝন্ঝনি জাগিয়ে ঝড় উঠ্‌ল। সাম্নে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা যেখানে আঁগুনের শিখা মেলে দিয়েছে তারি ওপরে ঝড়ো হাওয়ার ফণা জ্বল্ছে। এক মুহূর্ত্তেই গাছের তলায় লাল কার্পেটের একখানা আস্তরণ আস্তৃত হ'য়ে গেল।

'করিডোরে'র এখানে ওখানে নার্সগুলো দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পেছনে পেছনে মেডিক্যাল ষ্টুডেন্টদের দল। অনেকের মুখেই লালসার চিহ্ন বাইরের ঐ ঝড়ের মতোই সুস্পষ্ট।

এবার ঝড়ের সাথে সাথে আকাশের ঝরণাটাতেও বান ডাক্‌ল। গাছের মাথা ভিজিয়ে, পথের ধূলো মাড়িয়ে বৃষ্টি ঝরছে ঝর্ ঝর্ ঝর্। বৃষ্টির ধারা বাতাসের বুকে যে চিক্ ফেলে দিয়েছে তার ফাঁক দিয়ে রহস্যের শুধু একটা আভাস পাওয়া যায়—পেছনের আর কিছুই দেখা যায় না।

বৃষ্টির ছাঁট্ এসে গায়ে লাগ্‌ছে একটা স্নেহ-শীতল হাতের স্পর্শের মতো! নিজেকে সরিয়ে নিতে চাচ্ছি—পারছিনে।

হঠাৎ সেই নার্সটা সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—ও কি হচ্ছে? জলে ভিজ্‌ছ যে—অসুখের ভয় নেই?

কি খেয়াল হ'লো ব'লে ফেল্‌লুম—অসুখ ভালো হ'য়ে যাচ্ছে ব'লেই তো তোমাকে আর কাছে পাইনে। যদি বাড়ে তবে হয়তো একটুখানি বেশী ক'রেই কাছে পাবো। অসুখ বাড়ার ভয়ের চেয়ে এই কাছে-পাওয়াটার লোভ তো কম নয়।

তার চোখে সেই রহস্যময় দৃষ্টিটা আবার জেগে উঠ্‌ল।

সে হেসে বল্‌লে—Please don't carry coal to New-Castle. এমনি ধরণের প্রেমের কথা যে কত শুনেছি তার ঠিক নেই।

ভারি রাগ হ'লো—বল্‌লুম—অসুখে প'ড়ে মানুষ যখন হাসপাতালে আশ্রয় নেয়, তখন যারা একটু আদর করে, দু'টো মিষ্টি মুখে কথা কয়, তাদের কাছে-আসাটা মানুষের ভালো লাগে। এই ভালো-লাগা আর ভালোবাসা এক জিনিষ নয়। তা ছাড়া জানি, আমি বাঙালী আর তুমি তাদেরই জাত যারা আমাদের পা'র তলে চেপে রেখেছে।

একটু ব্যথার হাসি হেসে সে বল্‌লে—কিন্তু তুমি তো জানো না—বাঙালীকে ঘৃণা করবার আমার অধিকার নেই। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি কি না, তাই নতুন ক'রে কাউকে দুঃখ দেবার কথাটা মনে হ'লে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কঠিন হ'য়ে ওঠে।

একটা খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পার্‌লুম না। ব'লে বল্‌লুম—কিন্তু তোমার সহকর্ম্মীদের ধর্ম্ম তো দেখ্‌ছি হাসপাতালের ধর্ম্ম নয়। তারা রুগ্নকে তো দুঃখ দেয়ই, সুস্থ মানুষকেও দুঃখ দিতে দ্বিধা করে না। চেয়ে দেখো তোমার সাম্‌নের ঐ 'করিডোর'টাতে।

খোঁচাটা গায়ে না মেখেই সে বল্‌লে—কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার কি সুবাদ? আমি সেবা করি নিজের দুঃখটাই ভোলবার জন্যে। তাই তো সেবা নিয়ে খেলা করা আমার পোষায় না।

একটা অপূর্ব্ব আন্তরিকতায় তার সুরটা যেন কান্নার মতো করুণ হ'য়ে উঠ্‌ল। বাইরে বৃষ্টির ধারার ভেতর দিয়ে ধরণীর বুকের কান্নাও ঝ'রে পড়্‌ছিল একেবারে অজস্র ধারায়। দু'টো কান্নায় মিলে মনে যে মোহ জাগালো, তারি ঝোঁক্‌ সাম্‌লাতে না পেরে খপ্‌ ক'রে তার হাতখানা ধ'রে ফেলে বল্‌লুম—তোমার মুখের ঐ যবনিকাটা খুলে' ফেলো নার্স।

মুখের ওপর তা'র রহস্যের ছায়াটা আরো গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌ল। তারপর ধীরে ধীরে রৌদ্রের দীপ্তিতে হেমন্তের কুয়াশা যেমন মিলিয়ে যায়, একটা স্নিগ্ধ করুণ হাসির দীপ্তিতে তার মুখের এত দিনকার আবরণের খানিকটাও যেন তেম্‌নি ক'রে মিলিয়ে গেল।

সে বল্‌লে—তুমি কি জান্‌তে চাও?

আমি বল্‌লুম—তোমার জীবনের ইতিহাস।

—সে তো ভারি ছোট জিনিস। তোমাকে বল্‌তে

হয়তো পাঁচ মিনিটেরও বেশী সময় লাগ্‌বে না। কিন্তু মনের ইতিহাস তো বলা যায় না—আমাদের বাইরের যবনিকাটা যে তারি একটা ছোট্ট খোলস মাত্র।

হেসে বল্‌লুম—মনের ইতিহাস বলা যায় না, কিন্তু তাকে বোঝা যায়। আমার এই বোঝ্‌বার শক্তিকে সন্দেহ না কর্‌লেও পারো।

সে বল্‌লে—কিন্তু সে যে দুস্তর সাগর। তার চেয়ে তোমাকে একটা গল্প বল্‌ছি শোনো।

বর্ষার সজল হাওয়ার ভেতর দিয়ে যে মোহ জেগে ওঠে, হল্‌টার এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তারি স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই সুপ্তিকে সুরের মদে আরো গাঢ় ক'রে তুলে'ই সে বল্‌তে সুরু কর্‌লে—এ গল্প তোমরা রূপ-কথার কল্যাণে অনেকবার শুনেছ। কিন্তু ঐ রূপ-কথাগুলোই তো মানুষের মনের আদিম ইতিহাস। তাইতো তারা কখনো পুরাণো হ'তে জানে না। এইবার শোনো—

পথে যেতে যেতে হঠাৎ একবার এক বিদেশী রাজকুমারের সঙ্গে এক বিদেশিনী রাজকুমারীর দেখা হ'য়ে গেল। আকাশে সেদিন জ্যোৎস্নাও ছিল না,

তারাও ছিল না। তাদের চেনা হ'লো বিদ্যুতের দীপ্তিতে। আকাশের বজ্র তাদের মিলনের পথে মাদল বাজালে।

রাজকুমারী বল্‌লেন—আমার হৃদয় এইবার তবে তোমাকে দিই রাজকুমার!

রাজকুমার বল্‌লেন—ঐ হৃদয়ই তো আমার সব সম্পদের সেরা সম্পদ্।

হয়তো সেই সম্পদই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'তো, কিন্তু দুর্দ্দিনের বন্ধুকে দীপ্ত দিনের আলোকে মানুষ ভুলে' যায়। কুমার ও কুমারীর ভেতরেও সেই বিস্মরণীর ছায়া নেমে এলো। দু'টো তরুণ-তরুণীর জীবনের বেলা-তট ঘিরে' যেমন অকস্মাৎ আলো জ্বলেছিল, বাঁশী বেজেছিল, বসন্তের আনন্দ-মঞ্জরীগুলো ফুটে' উঠেছিল, তেমনি অকস্মাৎ আলোও নিব্‌ল, বাঁশীও থাম্‌ল, পুষ্প-মঞ্জরীগুলোও শুকিয়ে গেল। গাছের ফুলকে চয়ন ক'রে নিয়ে মানুষ যেমন দুদণ্ডের পরেই তাকে পথের ধূলোয় ফেলে দেয়, কুমারীকেও পথের ধূলোয় ফেলে দিয়ে দু'দিন বাদেই রাজকুমারও তেমনি নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। কুমার তো হৃদয় চান্ নি—চেয়েছিলেন দেহ;—তাই দেহের প্রয়োজন যখন ফুরালো, হৃদয়টাকে উপেক্ষা করাও তাঁর পক্ষে কিছু-মাত্র কঠিন হ'লো না।

নার্সের কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ ভারি হ'য়ে থেমে যেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তারপর ?

—তারপর রাজকুমারী তার অন্ধকার রাত্রির শিয়রে দুঃখের দীপ জ্বেলে ব'সে আছে। কান্না তার শুকিয়ে গেছে, কিন্তু দিনের আলো এখনো তার কাছে এসে পৌঁছোয় নি। তাইতো পরের কান্নার শিয়রে ব'সে ব'সে তার রাত কাটে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কিন্তু রূপকথার রাজকুমারী-তো তার রাজকুমারকে ফিরে' পায়, তোমার গল্পের রাজকুমারী তাঁর রাজকুমাকে আর ফিরে' পান্ নি বুঝি ?

সে বললে—পেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে তখন যে ব্যবধানের রেখা রচিত হয়েছে এক রক্তের ধারা ছাড়া আর তাকে মুছে' ফেলবার উপায় নেই। বিদেশিনী কুমারীর প্রতিহিংসা হয়তো সেই রক্তের ধারার লোভেই মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ত, কিন্তু তার একটি ছোট বোনের মুখের দিকে চেয়েই সে তাকে মাপ করেছে।

আবার প্রশ্ন করলুম—কুমারী রাজকুমারকে ভুলতে পেরেছেন কি না জানো ?

উত্তরে নার্স একটু হাসলে। তারপর বললে—এইবার ঘুমোও, রাত জেগে আর অসুখ বাড়িও না।

আমি বল্লুম—ঝড় যখন জাগে, না-ঘুমোনোই তো তখন স্বাভাবিক। ছোঁয়াচে ব্যাধির মতো ঝড় একজনের মন হ'তে যে আর একজনের মনে প্রলয়ের দোলা জাগায়, সে কথা তুমি মানো কি না জানিনে—কিন্তু আমি মানি!

যা বলতে চেয়েছিলুম জানিনে, তার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে উঠ্‌ল কি না। সে শুধু ধীরে ধীরে আমার মাথাটা নেড়ে দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—বাদ্‌লার দোলা অনেকের মনেই ঝড় জাগায়। কিন্তু রৌদ্র যখন জাগে আকাশে তখন ঝড়ও থাকে না—মেঘও থাকে না। আজ হয়তো তোমাকে একটা ঘা দিয়ে গেলুম—কিন্তু কাল সকালে এ আঘাতের দাগটাও যে থাক্‌বে না তাও জানি।

মনে মনে বল্লুম—তুমি কিচ্ছু জানো না। অনেক দাগ আছে যা জীবন ক্ষ'য়ে যায় তবু মোছে না। তোমার নিজের বুকে যে দাগ পড়েছে সেই দাগটাকেই কি তুমি মুছে' ফেলতে পেরেছ!

* *
*

* *
*

বিকেলে বড় সাহেব এসেছিলেন। তাঁকে বললুম—শীতের দিনের ঠাণ্ডা জলের স্পর্শের মতোই একটা ব্যথায় এখনও হাড়টা মাঝে মাঝে কন্ কন্ ক'রে ওঠে। তিনি দেখে বললেন—ও কিছু নয়, দু'দিন বাদে আপনা থেকেই সেরে যাবে। সুতরাং হাসপাতালে থাক্‌বার আর আমার দরকার নেই।

মুক্তির পরোয়ানা পেলুম। দিনের আলোতেই সকলের কাছে বিদায় নেওয়ার পালাটাও শেষ হ'য়ে গেল। কেউ

কাঁদ্‌লে, কেউ বুকে জড়িয়ে ধর্‌লে, কেউ বল্‌লে—ভুলে' যাও যদি তো ভারি গোসা কর্‌ব।

কি যে বল্‌তে হয় জানে না। ওদের দুঃখ মন দিয়েই বুঝে' নিতে হয়। ওদের ব্যথা, ওদের দৈন্য, এমন কি ওদের হীনতা পর্য্যন্তও তাই আজ আমার মনের দোরে ছায়া ফেল্‌ছে। নকড়ি হয়তো কাল আর কারো কাছে তার পারিবারিক সুখ-দুঃখের ফিরিস্তি খুলে' বস্‌বে না—হরিশ সর্দ্দারের কান্নাটা হয়তো একলা একলাই ঝ'রে কেবল তার নিজের চোখের কোলেই বান ডাকাবে।

•

সাম্‌নের অন্ধকারের রাজ্যটা পার হ'য়ে চাঁদের ফালিটা আকাশের গায়ে জ্যোৎস্নার পাল তুলে' দিলে! খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে খানিকটে জোৎস্না বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়্‌ল।

জ্যোৎস্নায় চোখ্‌ বুঁজে' প'ড়ে আছি। টের পেলুম, নার্সটা দু'তিনবার আমার বিছানার পাশটাতে এসে দাঁড়ালো। একবার ডাক্‌লেও—বাবু! ঘুমের ভান ক'রে জবাব দিলুম না। হঠাৎ কি মনে ক'রে সে জোরে একটা নিশ্বাস ফেল্‌লে। সেটা এসে খচ্‌ ক'রে ঠিক যেন আমার বুকের মাঝ্‌খানটায় বিঁধে রইল। তবু বিদায়ের কথাটা তার

কাছে বল্‌তে পার্‌লুম না। অথচ সকলের আগে তার কাছ থেকেই তো বিদায় নেবার জন্যে মন উন্মুখ হ'য়ে ছিল। মুক্তির পরোয়ানাটা আজ বিকেলে পেয়েও যে ভবঘুরে মনটা এখনো এই হাসপাতালেই আট্‌কা প'ড়ে আছে, তার কারণ আর কেউ না জানুক আমি তো জানি।

ঘড়িতে বাজ্‌ছে দুই—তিন—চার। না ঘুমিয়েই তবে রাতটা শেষ হ'য়ে গেল! চোখ্‌ মেলে বাইরের আকাশের দিকে চাইলুম। সেখানে ভোরের শুকতারাটা জ্বল্‌ছে একটা পথহারা উল্কার মতো। ওরি কাছ থেকে দীপ্তি নিয়ে বুঝি আমার মতো বেদুইনের দল দুস্তর মরু-পাথারের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়!

এক একবার মনে হচ্ছে, ভোরের রাত্রির এই নিস্তব্ধতার ভেতরেই না হয় নার্সটাকে কাছে ডেকে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাখি। ব'লে যাই---চল্‌লুম-- মনে রেখো। কিন্তু কেবলি ভয় হচ্ছে, মনের গোপনে যে কথাটা লুকিয়ে আছে, পাছে সেই কথাটাই তার কাছে ধরা প'ড়ে যায়। হয়তো বা এরই ভেতর মনের পুঁথিখানা ও প'ড়ে শেষ ক'রেও ফেলে দিয়েছে—সাবধানতার আর কোনোই দরকার নেই। কিন্তু আমার অবস্থা সেই

হরিণগুলোর মতো যাদের পালাবার পথ যখন ফুরিয়ে যায় তখন বালুর ভেতরেই মুখ 'গুঁজে' দিয়ে মনে করে—শিকারীর দেখার পথটাও বুঝি বন্ধ হ'য়ে গেছে।

সেই ভালো—না-বলা বাণী দিয়েই তবে আমার বিদায়ের গান রচিত হোক্।

শীতের কুয়াশায় স্থবির ধরণীর চুলগুলো যখন সাদা, চামড়া ঢিলে হ'য়ে গেছে এবং শরীরের যন্ত্রগুলো বিকল তখনই তার মনের বনে বসন্ত জাগে, ফুলের অপ্সরীরা ফুটে' ওঠে। বান যখন ডাক্‌বার কোনোই সম্ভাবনা নেই তখনই আমার জীবনের নদীটাতে জোয়ার জাগ্‌ল। জোয়ার যখন জাগ্‌লই, তখন যে ভাস্‌তে হবে সে তো জানা কথা। তবু ভালো, যে দরিয়ায় ভাসালো সে তার মুখের অবগুণ্ঠনটাও তুলে' ধরে নি। অচেনা পথের হাত-ছানিতে দুর্গম পাথার তবু পাড়ি দেওয়া যায়, কিন্তু চেনা পথের অবসাদ—সে তো সত্যিই অসহ্য।

পথের কথা মনে হ'তেই পথ হাতছানি দিলে। হাসপাতালের পোষাকটা ওয়ার্ডারের হাতে জেম্মা ক'রে দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম। পথে ভোরের বাতাসে ঝ'রে-পড়া কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো হোলির দিনের কুঙ্কুমের মতো

পাঁকের ফুল

মাটির বুকে প'ড়ে আছে। মাড়িয়ে যেতে যেতে মনে হ'লো, বুকের ভেতর এমনি রক্ত-রাঙা যে হৃদয়টা রয়েছে দু'পা দিয়ে কে যেন তাকেই মাড়িয়ে যাচ্ছে, পা দু'টো যার তাকে যেন চিনি। কিন্তু মুখের পানে চেয়েই চেনা অচেনায় মিশে' গেল!

ওপরের দিকে চেয়ে দেখি—নার্সটা একদৃষ্টে আমার পথের পানে চেয়ে আছে।

পথের বিপদ

পথের বিপদ

অত বড় আকাশটার কোনোখানে এতটুকু মেঘ ছিল না। তার নীল রঙ্‌টাকেও কে যেন রাক্ষসের মতো এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়ে শুষে' নিয়েছে। 'ক্যানভাসের' ওপর কয়েক পোঁচ্‌ড়া খড়িমাটি বুলিয়ে দিলে সেটা যেমন একটা শ্রীহীন শুভ্রতায় ভ'রে ওঠে, তেম্‌নি একটা শ্রীহীন নিষ্ঠুর শুভ্রতায় গোটা আকাশ ঢাকা। আর সেই শুভ্রতার বুক চিরে' ঝ'রে পড়্‌ছিল একেবারে বৃষ্টির ধারার মতো

ক'রেই রৌদ্রের ধারা। আকাশের আগুনের কটাহ-টাতে তখন যে দীপ্তি দেখেছিলুম তেমন দীপ্তি রৌদ্রের ভেতর আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে' নিয়ে কোনো রকমে রাস্তাটুকু পেরিয়ে ট্রামে চ'ড়ে বস্‌তেই মাথটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠ্‌ল। ঐ সামান্য রাস্তাটুকু পেরিয়ে আস্‌তেই মনে হ'লো, আমার দেহটাকে কে যেন আগুনে ফেলে ঝল্‌সে দিয়েছে। পা'র তলায় পিচ দিয়ে মোড়া রাস্তাটা গ'লে কাদার মতো নরম হ'য়ে তরল শীষার মতো গরম হ'য়ে উঠেছে। সুতরাং নীচের দিক থেকে যে ঝাঁঝ্ উঠ্‌ছিল তার তোড় ছিল ওপরের রৌদ্দুরের ঝাঁঝের চাইতেও ঢের বেশী অসহ্য। রাস্তা জনহীন বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। ট্রামগুলোতেও কণ্ডাক্টর ও চেকার ছাড়া আর কোনো লোককে ক্বচিৎ কখনো চোখে পড়ে। দিনের দুপুরেও যে রাত দুপুরের নির্জ্জনতা এই কল্‌কাতা সহরেই জেগে ওঠে সে খবরটাও এই প্রথম আমার কাছে ধরা পড়্‌ল।

এই অগ্নি-দাহের ভেতরে নিতান্ত বিপদে প'ড়েই পথে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিপদ যে

পথের বিপদ

পথেই আমাকে কুড়িয়ে নিতে হ'বে সে কথা কে জান্ত! ট্রাম তখনো এক রশির বেশি এগিয়ে যায় নি, হঠাৎ চেয়ে দেখি, একটি ভদ্রলোক ট্রামের সাথে সাথে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে' আস্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করছেন—এই কণ্ডাক্টর—এই—রোখো—রোখো।

সে জায়গাটা ট্রাম থামাবার জায়গা নয়। সুতরাং কণ্ডাক্টর ট্রাম থামাতে নারাজ। কিন্তু ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে ভারি মায়া হ'লো। ঘামে তাঁর গায়ের জামাটা ভিজে' স্যাতা হ'য়ে গেছে, পরনের কাপড়ের অবস্থাটাও তদ্রূপ। এই রৌদ্দুরের ভেতরেও মাথায় একটা ছাতা নেই। এক রকম ধমক দিয়েই কণ্ডাক্টরকে দিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিলুম।

ভদ্রলোক ট্রামে এসে উঠ্লেন। দেখি, তিনি অস্বাভাবিক রকমে ধুঁক্ছেন। চোখ্ মুখ এমন বেমাক্কা রকমে লাল হ'য়ে উঠেছে যে, মনে হ'লো প্রাণটা বুঝি দম ফেটে এখনি এই পথের মাঝখানেই বেরিয়ে পড়্বে। তাড়াতাড়ি এক পাশে স'রে সাম্নেই তাঁকে খানিকটা জায়গা ক'রে দিয়ে বল্লুম—এই খানটাতে ব'সে পড়ুন মশাই, নইলে হয়তো তাল সাম্লাতে গিয়ে টাল খেয়ে

প'ড়ে যাবেন। এই রৌদ্দুরেও নাকি কেউ ট্রামের পেছনে ছোটে!

হাঁপাতে হাঁপাতে কাটা কাটা কথাগুলো কোনো রকমে এক সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—সাধে কি ছুটি মশায়, নাকে দড়ি দিয়ে যে ছোটাচ্ছে। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়েই বললেন—আরে সুরেশ বাবু যে, চিনতে পারেন মশাই!

লোকটাকে কখনো দেখেছি ব'লে মনে হ'লো না। অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি আবার বললেন—এরি ভেতর বেমালুম ভু'লে গেছেন দেখছি। কলেজ তো আমরা খুব বেশী দিন ছাড়ি নি!

কলেজ যে খুব বেশী দিন ছাড়ি নি তা বেশ ভালো ক'রেই মনে ছিল। কারণ ইউনিভার্সিটির পারাখাট পেরিয়ে আনতে আমাকেও যে মাত্রার কাঠ-খড় খরচ করতে হ'য়েছিল তার পরিমাণটা ছিল একটু অসম্ভব রকমেই ভারি। বাড়ীতে বোঝাতুম, আশু মুখার্জির বিশ্ববিদ্যালয় বিশের মত ওঁচা ছেলে তরিয়ে দিচ্ছে, তাইতো তাদের সঙ্গে তরবার আমার কোনো তাড়া নেই। অথচ প্রত্যেক বার ফেলের পর পড়া-ভালো-হয়-নার দোহাই দিয়ে কলেজ বদ্লাতেও কসুর করতুম না। এমনি

ক'রে কল্‌কাতার সমস্তগুলো কলেজ আমার হাতের পাঁচ হ'য়ে উঠেছিল। সুতরাং ভদ্রলোকটির কথায় একটু অপ্রস্তুতের মতো হ'য়েই বললুম—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে বটে। কিন্তু কলেজ তো আমাকে দু'টো একটা পেরুতে হয় নি, তাই ভালো ক'রে ঠাহর করতে পারছিনে, কোন্ কলেজে আপনার সঙ্গে ভিড়ে প'ড়েছিলুম। কোথায় পড়েছি আপনার সঙ্গে?—রিপনে না সিটিতে?

ভদ্রলোকটি একটু মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন—কেবল রিপন, সিটি কেন, মেট্রো, স্কটিশ, বঙ্গবাসী অনেক কলেজেই আমি আপনার সঙ্গী ছিলুম। 'ষ্টিমলঞ্চ' গুলো তো হুস্ হুস্ ক'রে জল কেটে বেরিয়ে গেল, প'ড়ে রইলুম আমরা শুধু গাধা বোটের দল। আর প'ড়ে থাক্‌বই বা না কেন? মা সরস্বতীর সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ ছিল, আর যাই হোক, সে যে মধুর সম্বন্ধ ছিল না, তাতে তো এতটুকুও ভুল নেই! কলেজ কামাই দিতুম না, পাছে পেছনের বেঞ্চে ব'সে আড্ডা জমানোটা কামাই যায়, হাসি মশ্‌করা, প্রফেসারকে ভ্যাঙ্‌চানো বাদ পড়ে। সুতরাং মা ঠাক্‌রুণ বর দিতে অত দেরী ক'রে অন্যায় যে কিছু ক'রেছিলেন, আর যে অপবাদই তাঁকে দিই না কেন, এ অপবাদটা তো তাঁকে কিছুতেই দিতে পরব না।

কিন্তু সুরেশ বাবু, আপনার স্মৃতি শক্তি যে এত খারাপ হ'য়ে গেছে তা তো জানতুম না। মাঝখানে কোনো কঠিন ব্যাধিতে ভোগেন নি তো?

ব্যাঙ্কের 'কোরিডোরে' দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আগেও এই সব বিষয় নিয়ে অমরেশের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। বায়োস্কোপের ছবির মতো সে সব ঘটনা চোখের সাম্‌নে ডানা মেলে আছে। অথচ কিছুতেই এ লোকটাকে মনে কর্‌তে পার্‌ছিনে!

স্মৃতি শক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় রীতিমত নিজের ওপর চ'টে গিয়ে কি ক'রে এই লজ্জাকর অবস্থাটার হাত হ'তে মুক্তি পাবো ভাব্‌ছি, হঠাৎ চোখ্‌ প'ড়ে গেল তার ছাতার কয়েকটা হরফের ওপর। তাতে লেখা ছিল—বি, বসু।

একটু আশ্বস্ত হ'য়ে বল্‌লুম—কিছুই ভুলি নি ভাই বোস্‌। কেবল দূরের স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিতে যা একটু দেরী হচ্ছিল। কিন্তু আপনার বিপদটা কি শুনি?

মহাউত্তেজিত হ'য়ে উঠে' তিনি বল্‌লেন—বিপদ ব'লে বিপদ! যদিও নিজের নয়, তবু পাড়ার লোকের বিপদ,

সে তো নিজের বিপদেরই সামিল।—বিশেষতঃ আজ্‌কালকার এই অবস্থায়। জানেন তো এই ক'টা মাস ধ'রে দেশের ভেতর কি ঝামেলা চলেছে আমাদের ফতে-উল্লা, ইউসুফ আলি, ওরফান সেখ প্রভৃতি মিঞা-ভাইদের নিয়ে। তারা যে কবে ইরাণ তুরাণ থেকে এসে এ দেশে বাসা বেঁধেছিল জানিনে, কিন্তু একথা তো বেশ ভালো ক'রেই জানি যে, ওদের শতকরা ৯৯ জনই আমাদের ঐ ইচ্ছা মাইতি, নরহরি প্রামাণিক, হারু মালী প্রভৃতি হিন্দুদেরই বংশধর। ওদের শিরা কাট্‌লে হয়তো এখনো হিন্দু বাপ-মার রক্তের ধারা ধরা পড়ে। ওরা আবার বলে কি জানেন,—ওদেরি আঠারো জন এসে নাকি বাংলাদেশটা জয় ক'রে নিয়েছিল, আর বাঙ্গালীর মুরোদ যে কত তাতেই নাকি ধরা পড়েছে! নতুন ক'রে পড়্‌তে শিখ্‌ছে কিনা, তাই বড় বড় বুলি কপ্‌চায়। দিয়েছি তেমনি সেদিন ঠুকে' ও-পাড়ার ঐ হামবড়া মৌলবীটাকে। ব'লে-ছিলুম—মৌলবী সাহেব, তোমাদের ও কথাটা একবারেই ঠিক নয়। আর ঠিক হ'লেও আমাদের তাতে যতটা অগৌরব, তার চাইতে ঢের বেশী অগৌরব তোমাদের। আমরা তবু তাদের মার খেয়েও নিজেদের ধর্ম্মে টিকে' আছি, কিন্তু এমনি তোমাদের ধনের লোভ ও প্রাণের

মায়া যে, জাত খুইয়ে, কাছা কোঁচা ছেড়ে লুঙ্গি পর্‌তে তোমাদের মনেও বাধে নি, কাজেও বাধে নি। ভাগ্যে খৃষ্টানদের সেই 'ইনকুইজিসনের' যুগ নেই, নতুবা আবার মুসলমান ধর্ম্মে তোবা ক'রে খৃষ্টানদের মতো হ্যাট কোট প'ড়ে নিজেদের খাস ইংলণ্ডের লোক মনে কর্‌তেও তোমাদের বাধ্‌ত না। ব'লেই বন্ধু হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

আমি বল্লুম—কিন্তু আপনার বিপদের কথা তো কিছু বল্‌ছেন না!

—বল্‌ছি মশায়, বল্‌ছি। তুর্কি-ভায়াদের সঙ্গে থেকে থেকে আপনিও দেখ্‌ছি তুর্কি-সোয়ার ব'নে গেছেন। ব'লেই তিনি আবার হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। তারপর হঠাৎ এক মুহূর্ত্তেই হাসিটাকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—এইবার বল্‌ছি শুনুন!—

।

আমাদের পাড়ায় উমেশ হালদার ব'লে একটা লোক ছিল। মাছের ব্যবসা ক'রে সে ঢের টাকা জমিয়ে গেছে। ছেলে-পেলে নিয়ে বেশ একরকম সুখে স্বচ্ছন্দেই তার জীবন কাটছিল, হঠাৎ একদিন কি ক'রে পর্দ্দার আব্রু ভেদ ক'রে তার চোখ্ পড়্‌ল, তার মুসলমান ভাগীদারের

স্ত্রী ফয়জানের ওপর। এই ফয়জান বাইজিটি আগে নাকি খাতায় নাম লিখিয়ে কোনো পল্লী বিশেষ গুলজার ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু উমেশের ভাগীদারের পয়সার জোর একদিন তাকে যখন বোর্‌খা পরিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে নিলে, তখন ফয়জান বিবি হ'য়ে গৃহস্থ ঘরের ঘরণী হ'তেও ফয়জান বাইজির বাধ্‌ল না। বিবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন উমেশের সাথে তার ভাগীদারের মৈত্রী প্রায় শেষ সীমায় টেনে এনেছে, তখনই একদিন ভাগীদারের জীবনের খেলা ফুরিয়ে গেল এবং উমেশ স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ী ছেড়ে ফয়জানকে নিকা ক'রে ওসমানউদ্দিন সেজে বস্‌ল। এ মশাই, আজকার কথা নয়, দশ বৎসর আগের কথা। এ দশ বৎসর আমরাই পড়ার দশ জনে উমেশের পরিবার ও তার ছেলে-মেয়েদের আগ্‌লে ব'সে আছি। কে জান্‌ত আজকার এই দুর্দ্দিনে সে ফিরে এসে এমন ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌বে!

সাময়িক উত্তেজনা যা গাঢ় হ'য়ে সকলের ভেতর তখন জট পাকিয়ে ব'সেছিল তার হাত থেকে আমিও মুক্ত ছিলুম না। তাই কিঞ্চিৎ উষ্ণ হ'য়েই ব'লে বস্‌লুম— বেশতো, সে যদি এসেই থাকে আপনারাই বা তাকে অত বিপদ ব'লে মনে করছেন কেন? আপনারা তাকে

শুদ্ধি ক'রে ঘরে তুলে' নিলেই তো পারেন! ছুঁৎমার্গকে অনুসরণ ক'রে হিন্দু যে কত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে সে তো প্রতিদিন চোখের ওপরেই দেখ্‌ছেন!'

বোস্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ স্বরটাকে উচ্চতর ক'রে তুলে' বল্‌লেন—সে হ'লে তো বাঁচ্‌তুম মশায়! আগে শুনুন ব্যাপারটা কি, তারপর যত খুশী মন্তব্য পাশ করবেন। উমেশের একটা মেয়ে ছিল, তার বয়স বছর তেরো হবে। বিয়ের জোগাড় চল্‌ছিল, হঠাৎ কাল রাত্রে সে হার্টফেল ক'রে মারা গেছে। আমরাই পাড়ার দশ জনে মিলে' তার সৎকারের ব্যবস্থা কর্‌ছিলুম, খাটে তোল্‌বার চেষ্টা চল্‌ছে এমন সময় হঠাৎ উমেশ দশ বারো জন লোক নিয়ে' বাড়ী চড়াও ক'রে বল্‌লে—আমার মেয়ে যখন তখন ও মুসলমান। ওকে আমরা গোর দেবো, কিছুতেই দাহ করতে দেবো না। দেখুন দেখি, অত বড় একটা করুণ ব্যাপার, মা-টা শোকে পাগলের মতো পথের ওপর লুটিয়ে পড়্‌ছে, মাথা কুট্‌ছে, চুল ছিঁড়্‌ছে, তার হাহাকারে বনের পশুও থম্‌কে দাঁড়ায়—আর ও ব্যাটা কিনা এম্‌নি সময়ে এসে বলে—গোর দেবো!

উত্তেজনায় আমার শরীরের ভেতরেও রক্তের কণাগুলো তখন গরম হ'য়ে উঠেছে। আমি বল্‌লুম—আর সেই

আব্দার আপনারা সহ্য করলেন! মেরে ভাগিয়ে দিতে পারলেন না ব্যাটাকে!

তিনি বললেন—সহ্য আর করলুম কোথায়? ঢের অনুরোধ করেছি মশাই, কিন্তু এই দশ বছরে তার যা চেহারা হ'য়েছে, তা দেখে তার কাছ থেকে কোনো রকমের অনুগ্রহের আশা করাই আমাদের ভুল হ'য়েছিল। ঠিক যেন একটা জানোয়ার! জানোয়ারের যা ওষুধ তাই দিয়ে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু তার পরের চোট্টা সাম্লাবারই পথ খুঁজে' পাচ্ছিনে। আমাদের পাড়ায় যদি একবার যান তো দেখ্তে পাবেন, রাস্তার দু'ধারে কেবল লম্বা দাড়ির দোলা দুল্ছে এবং লম্বা ফেজের ফানুস উড়্ছে। মেয়েটাকে নিয়ে যে নিমতলার রাস্তার দিকে রওনা হ'বো তারও সাহস খুঁজে' পাচ্ছিনে। তাইতো এসেছিলুম লালবাজারে পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকে খবর দেবার জন্যে। কিন্তু এইবার উঠি—এইখানটাতেই যে আমাকে নামতে হ'বে।

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে ট্রামের দড়িটা ধ'রে টান দিয়ে তিনি আবার বললেন—কতই যে নতুন ঢং হচ্ছে, দেখে হাসিও পায় দুঃখও ধরে। ঐ দেখুন মশায়, ট্রামের গায়ে এরাও লিখ্তে সুরু ক'রে দিয়েছে—"Beware of

Pick-pokets." কিন্তু চললুম এইবার, সুরেশবাবু—নমস্কার!

হাত তুলে' তাঁকে প্রতি-নমস্কার ক'রে ব'সে ভাবতে লাগলুম, কন্যাহারা মাতার ব্যথা আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মত্যাগী বাপের পাশবিকতা। দু'টোতে মিলে' আমার সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুতের জ্বালা জাগিয়ে দিয়ে গেল। বাইরে খাঁ-খাঁ-করা রৌদ্দুরের অজস্র সাদা হাসিটে তখনো গলিত ধাতুর ধারার মতো ক'রেই ঝ'রে পড়ছিল। মনে হ'লো—যেন সেই উমেশের বিশ্রী বীভৎস হাসিটাই গোটা সহরের বুকের ওপর আজকের রৌদ্রের ভেতর দিয়ে জ্বলছে!

কি দুঃখ এই হতভাগিনী নারীর! যাকে দীর্ঘ দশ বৎসর স্বামী ত্যাগ করেছে, আর আজ যাকে বুকের দুলালী মেয়েও ত্যাগ ক'রে গেল, তার বুকের ভেতর যে আগুন ঝরছে তার জ্বালা তো অমনিই কম ছিল না। হঠাৎ যদি আবার সেই হারিয়ে যাওয়া স্বামী ফিরেই এলো, তবে এই সাম্প্রদায়িকতার ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত বন্য পশুটাকে এমন ক'রে উৎকট ক'রে না তুলে' কি সে আসতে পারত না! ইংরেজের আইনের কাছে নালিশ জানানো—সেও তো অপমানের আর একটা পিঠ! এই যে মসজিদ-মন্দির

নিয়ে গোলমাল বেধেছে, দেশ স্বাধীন হ'লে এর মীমাংসা কি এম্‌নি ক'রেই হ'তো? কে একজন শের উড্ কবে কার ভুলে লাঞ্ছিত হ'য়েছিল, তারি জন্যে অত বড় জালিয়ান ওয়ালাবাগটা ঘটিয়ে ইংরেজ সেই অপমানের কি চরম প্রতিশোধটাই না নিয়েছে—তার কথা তো এখনও ভুলি নি। কিন্তু আজ যে শত শত নর-নারী গুণ্ডাদের ছোরার ঘায়ে প্রাণ দিচ্ছে, তাদের লুণ্ঠনে সর্ব্বস্ব খোয়াচ্ছে,—ধর্ম্ম, নারীর মান-সম্ভ্রম কিছুই যে আজ আর নিরাপদ নেই, তবু তো এদের বিশ্রামের এতটুকু ব্যাঘাত হচ্ছে না।

এম্‌নি ধরণের পুঞ্জীভূত চিন্তার জাল রচনা করতে করতে চলেছি, এরি ভেতর শ্যামবাজারের ডিপোর কাছে ট্রাম যে কখন এসে পৌঁছে গেছে কিছু টের পাই নি। কণ্ডাক্টর এসে বল্‌তেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম।

হঠাৎ মনে পড়্‌ল বসু বন্ধুর যাবার বেলার সেই কথাটা —Beware of Pick-pokets. পকেটে হাত দিয়ে দেখি, সাবধান হওয়ার আগেই পকেট হ'তে সাতশো টাকার নোটের তাড়াটা উধাও হ'য়ে কোথায় উড়ে' গেছে—কাটা-পকেটটা কেবল হাঁ ক'রে প'ড়ে আছে Pick-poket-এর হাত-সাফাইয়ের নীরব অথচ অত্যন্ত মুখর

সাক্ষোর মতো! কাজটা যে কার বুক্‌তে একটুও দেরী হ'ল না। কারণ সারা রাস্তায় ঐ একজন যাত্রী ছাড়া আর একটি লোককেও আমি ট্রামে উঠ্‌তে দেখি নি।

সামনে পূজোর বাজারে ঐ সাতশো টাকা দাম আমার কাছে সাত হাজারের চাইতে কিছুমাত্র কম ছিল না। মেয়েটা আজ দু'বছর থেকে একখানা বেনারসী শাড়ী চেয়ে রেখেছে, দিতে পারি নি—ভেবেছিলুম এবার দেবো; মণ্টু, পণ্টু তাদের মাকে নিয়ে মামার বাড়ী যাবে—মামা বড় লোক, সুতরাং তাদের সেই রকমের পোষাক-পরিচ্ছদগুলো কিনে দিতে হ'বে, বাজারের বাকি দেনাগুলোও দোকানদারেরা পূজার মরশুমে ফেলে রাখ্‌বে না; বাড়ীর সমস্ত লোককে এখানে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজেও এবাঁর বেরিয়ে পড়্‌ব ব'লে মনে করেছিলুম, কিন্তু এক মুহূর্তে 'আলনাসকারে'র স্বপ্নের মতো সমস্তই ভেঙে গেল।

একটা গভীর ব্যথা এবং তার চাইতেও দুঃসহ লজ্জার বিমূঢ়তা নিয়ে বাড়ীর পথ না ধ'রে ধরলুম শ্যামবাজারে যে নতুন পার্কটা গ'ড়ে উঠেছে সেই পার্কের পথ। আমি

পথের বিপদ

একটা গাছের তলায় কতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সেছিলুম জানিনে, হঠাৎ জেগে দেখি, দিনের শেষ রশ্মি মিলিয়ে গিয়ে তার ওপর রাতের আভাস নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। দূরে কাছে গ্যাসের আলো জ্বল্‌ছে, অন্ধকার-দানবের আগুন-ভরা জ্বলন্ত চোখের মতো। এই সৌধারণ্যের গুমোটে ভরা কল্‌কাতার সহরটায় স্বাভাবিক আলো যতই অল্প হোক্ না কেন, কিন্তু কৃত্রিম আলো তার ফাঁদ এমন ভাবেই পেতে রেখেছে যে, অন্ধকারে দু'দণ্ড ব'সে কেউ যে আপনাকে জগতের সব সম্পর্ক হ'তে সরিয়ে নিয়ে গোপন ক'রে রাখ্‌বে তারও সুবিধেটুকু নেই।

* *
*

* *
*

রাত তখন আটটা বেজে গেছে।—

ধীরে ধীরে উঠানে এসে দাঁড়াতেই মনোরমা ছুটে' এসে বল্‌লে—ফিরে এসেছ তুমি! কি যে ভাবিয়ে তুলেছিলে বাপু! রাত্রি দিন চল্‌ছে ছোরা-ছুরীর কারবার—মানুষকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে যদি একটু নিশ্চিন্ত থাক্‌বার জো থাকে! কিন্তু এত দেরী হ'লো যে তোমার?—টাকা পেয়েছ?

আমি বল্‌লুম—পেয়েছিলুম, কিন্তু রাখ্‌তে পার্‌লুম না।

—সে কি কথা! গুণ্ডায় কেড়ে নিলে বুঝি।

—কতকটা সেই রকমই বটে।

এবার আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে সে আমার কাঁধে হাত রেখে বল্‌লে—টাকা নিয়েছে নিক্, তোমার ওপর কোনো রকমের অত্যাচার করে নি তো তারা?

চেয়ে দেখ্‌লুম, চোখের কোলে জল তার ছল্‌ছল্ করছে—ভয়ে মুখটা রক্ত হারিয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে।

আমি বল্‌লুম—না অত্যাচার করে নি। কিন্তু এবার-কার পূজোয় তোমাদের কাউকে যে কিছু দিতে পারব তা তো মনে হয় না, মণি!

সে বল্‌লে—ছিঃ ছিঃ তারি জন্য তুমি এতটা মন-মরা হ'য়ে রয়েছ! ভালোয় ভালোয় যে ফিরে এসেছ এই আমার ঢের। ঠাকুরকে এখনই আমি হরিলুট আনিয়ে ভোগ দিচ্ছি।

তার ইচ্ছার কোনোরূপ প্রতিবাদ না ক'রে মেয়ে মিনুকে ডেকে বল্‌লুম—তোমার অক্ষম বাবা এবারেও যে তোমাকে বেনারসী কিনে' দিতে পার্‌লে না মা!

সে আমার কোলের কাছটাতে আরো খানিকটা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—চাইনে বাবা, আর বচ্ছর তুমি আমাকে যে শাড়ীখানা কিনে দিয়েছিলে সে তো ছেঁড়ে নি। ওতেই আমি এ বছরও চালিয়ে নেবো।

মন্টু আপনা থেকেই ব'লে উঠ্‌ল—আমার পোষাক-টাও একদম নতুন আছে বাবা. আমিও. কিছু চাইনে এবার। কিন্তু পল্টু ভারি দুষ্টু কি না—সে তার

জামাটা একেবারে ছিঁড়ে' ফেলেছে—তাকেই একটা জামা কিনে' দিয়ো।

পল্টুর মুখে একটা চুমো দিয়ে তাকে বুকে তুলে' নিয়ে বল্লুম—হ্যাঁ বাবা, তুমি নাকি ভয়ানক দুষ্টু!

সে বললে—না বাবা, আমি দুট্টু না—মন্টু দুট্টু।

এদের এই স্নেহের প্রলেপে সাত-শো টাকার শোক আমার এক নিমিষেই শরতের মেঘের মতো কোনো রেখা না রেখেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু মনের কোণটা জুড়ে' ব'সে রইল, উমেশের স্ত্রীর বেদনা-কাতর মুখের একটা কাল্পনিক ছবি। গল্পটা হয়তো মানুষটার মতোই আগাগোড়াই মিথ্যা। কিন্তু তবু তার মোহ আমাকে এমনি ভাবেই জড়িয়ে ধ'রে আছে যে, তার জের কাটিয়ে ওঠ্বার মতো জোর আমি কোথাও খুঁজে' পাচ্ছিনে।

মীনা

মীনা

সেণ্ট্রাল-এভিনিউয়ের যেখানটা বৌবাজার পেরিয়ে এসপ্লানেডের দিকে মোড় ফিরেছে, তারি কাছে একটা খালি যায়গা দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোকের ভিড়ে ভ'রে উঠ্‌ল। ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম। সুতরাং ব্যাপারটা যে কি দেখ্‌বার জন্যে যায়গাটাতে 'ঢু' মেরে যাওয়ার লোভও সম্বরণ করতে পারলুম না।

সারা রাত্রি ধ'রে বিপুল বর্ষণের পর ভাদ্রের রৌদ্র একটা অত্যন্ত স্নিগ্ধ হাসি দিয়েই প্রভাতকে বরণ ক'রে নিয়েছিল। সুতরাং বেলা আটটা বেজে গেলেও মাথার ওপরকার দাহটা আটটার মতো ছিল না। রাত্রের বুক-ভাঙা কান্নার পর দিনের এই মুখ-ভরা হাসির ভেতর

মাদকতাও ছিল প্রচুর। তাই পথের খেলা কাজের মনকেও ভুলিয়ে দিলে।

ভিড়ের ভেতর ঢুক্‌তেই দেখ্‌লুম, একটা জিপ্সীর দল ভোজবাজির কসরৎ দেখাতে সুরু ক'রে দিয়েছে। দলটা বেশ ভারি—অনেকগুলো ছেলে-মেয়েতে ভর্ত্তি। কিন্তু এদের ভেতর আর সবাইকে পেছনে ফেলে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে এসে একেবারে আলাদা হ'য়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ের দীপ্ত-শ্রী। জিপ্সীদের চেহারা যে অত সুন্দর হয় এই মেয়েটিকে দেখার আগে তা কখনো কল্পনাও করতে পারি নি।

মেয়েটাই কসরৎ দেখাচ্ছিল। একখানা তাসকে চারখানা করা, চারটি গুলির একটি রেখে বাকিগুলো সব উড়িয়ে দেওয়া, একগাছা দড়ি থেকে জ্যান্ত সাপ গড়া, কয়লার গুঁড়ো ভিজিয়ে তাকে চিনির সরবৎ ক'রে তোলা, গাছ পুত্‌তে-না-পুত্‌তেই তাতে ফুল ধরানো—এমনি ধরণের সব কসরৎ। কসরৎ দেখানোর ভেতর কোনোখানে কোনো খুঁৎ ছিল না। কিন্তু তার কসরতের চাইতেও যা আমার মনকে দোলা দিলে তা তার চলা-ফেরার স্নিগ্ধ ভঙ্গি। তার কোনোখানে এতটুকু দৈন্য নেই, অথচ অনাবশ্যক আড়ম্বরের ভারেও তা ভারি নয়।

ভেবেছিলুম একটু 'ঢুঁ' মেরেই চ'লে যা'ব। কিন্তু মনটা এক নিমিষেই আটকে গেল এই মায়াবী মেয়েটির অদ্ভুত লীলা-নৈপুণ্যের ভেতর। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ পর্য্যন্ত কসরৎগুলো দেখতে লাগলুম।

এমনি ক'রে প্রায় ঘণ্টাখানেক চ'লে গেল এবং বিস্মিত দর্শকদের ভেতর থেকে অজস্র তারিফ কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি তার খেলাও শেষ করলে। এইবার চ'লে যা'ব ভাবছি, এমন সময় দলের 'ওস্তাদ উঠে' দাঁড়িয়ে তার কথার কসরৎ সুরু করে দিলে। সে বললে, এইবারে যা দেখানো হ'বে সেইটেই শেষ খেলা এবং খেলাটাও এমনি আশ্চর্য্য যে, এ-রকমের যাদু দেখবার কল্পনাও আমরা কখনো করতে পারিনে। এই যে আউরৎ, যে এতক্ষণ ধ'রে এত খেলা দেখালে, এইবার সে তাকেই আশমানের মেঘের মধ্যে উড়িয়ে দেবে। অবশ্য এ-কথাও যেন আমরা ভুলে' না যাই যে, আকাশের হুরীকেই সে মন্ত্রের বলে খেলা দেখাবার জন্যে মর্ত্ত্যের মাঝখানে টেনে এনেছিল।

সুতরাং আবার দাঁড়িয়ে পড়লুম। এবার ওস্তাদের ভনিতা শেষ হ'তেই মেয়েটাকে হিড়্-হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে মাঝখানের খালি যায়গাটাতে বসিয়ে দেওয়া হ'লো একটা মোটা কাপড়ের পর্দ্দা ঢাকা দিয়ে। তারপর

আবার আরম্ভ হ'ল আত্মারাম সরকারের হাড়ের স্তুতি-গান। এমনি ভাবে মিনিট পনেরো কাটবার পর দেখা গেল—সেই কাপড়ের ঘেরা-টোপের ভেতর থেকে একটা পায়রা ওপরের দিক উঠে' যাচ্ছে।

পাখীটাকে উড়্তে দেখেই ওস্তাদ একেবারে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্ল, বল্লে—ঐ যে আমার দিলের দোস্ত, আমার জান, আমার কলিজা আশ্মানের মাঝখানে মিলিয়ে যাচ্ছে। ও তো চিড়িয়া নয়, চিড়িয়ার ছদ্মবেশে আকাশের হুরী। তারপর বিনিয়ে বিনিয়ে সে কি কান্না তার।

কান্নার বহর শুনে' আমরা সকলে হেসে উঠ্তেই সে বল্লে—হুজুর আপনারা বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু এই দেখুন, যে মেয়েটিকে আপনাদের সাম্নেই পর্দার আড়ালে রেখেছিলুম সে আর সেখানে নেই। ব'লেই সে কাপড়ের ঢাক্নাটা তুলে' ফেল্লে। চেয়ে দেখ্লুম, মেয়েটা সত্যি সত্যি পর্দার ভেতর থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

অদ্ভুত কান্নার সুর ভেজে ওস্তাদ আবার বল্লে—হুজুর, আপনারা যদি মেহেরবাণী করেন তবে আপনাদের দিলকে যে এতক্ষণ ধ'রে খুসী করেছে তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি। তবে সে জন্য জীনকে শীর্ণী দেওয়া দরকার। কিন্তু আমি ভারি গরীব।—পয়সা

নেই। শীর্ণীর পয়সা আপনারা সকলে মিলে আমাকে কিছু কিছু যদি ভিখ্ দেন……

খেলা দেখে বাস্তবিকই খুসী হ'য়েছিলুম। তাই দ্বিধা না ক'রে মণি-ব্যাগটা খুলে' ঝণাৎ ক'রে একটা টাকা ওস্তাদের সাম্‌নে ফেলে দিলুম। তারপরেই চারিদিক থেকে পয়সা, একআনি, দোয়ানি প্রভৃতি বৃষ্টির ফোঁটার মতো তার সাম্‌নে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। লাভ নেহাৎ মন্দ হ'লো না। কারণ দেখ্‌লুম, ওস্তাদের মুখের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ভেদ ক'রে ভেতরের আনন্দের আভাসটা তার ছোট ছোট চোখ্ দু'টোর মধ্যেও স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে' উঠেছে।

এইবার টাকা পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে অবোধ্য ভাষায় কি সব মন্ত্র পড়্‌তে সুরু কর্‌লে—বল্‌লে জীন-দেবতাকে শীর্ণী মান্‌ছে। এমনি ভাবে খানিকক্ষণ বিড়্‌বিড়্ ক'রে ব'কে একবার আপনার মনেই হেসে উঠ্‌ল। তারপরেই ভিড়ের লোকদের দু'হাতে সে সেলাম বাজাতে সুরু ক'রে দিলে। সেলাম ও হাসি সমান ভাবে খানিকক্ষণ চালিয়ে অবশেষে সে আবার ব'লে উঠ্‌ল, জীন-দেবতা তার ডাকে প্রসন্ন হ'য়েছেন এবং তার আউরৎ ফের দুনিয়ায় ফি'রে এসেছে। এই ভিড়ের ভেতরেই সে আছে। আমরা যে তাকে লুকিয়ে রেখেছি, আর দেরী

না ক'রে যেন দয়া ক'রে বা'র ক'রে দিই। এই ব'লে সে ভিড়ের চা'রদিকে ঘুরে' বেড়াতে লাগ্‌ল। তারপর খানিকটা ঘুরে' ফিরে' চট্‌ ক'রে আমার কাছে এসে থেমে গিয়েই বল্‌লে—এই যে বাবু, আমার বিবিজানকে পেয়ার ক'রে আপনিই লুকিয়ে রেখেছেন।

আশ্চর্য্য হ'য়ে পাশে চেয়ে দেখি মেয়েটা আমারি পিঠের ওপর মুখ লুকিয়ে আগা-গোড়া বোর্‌খা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওস্তাদ তার দেহ হ'তে বোর্‌খাটা টেনে নিতে নিতে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—বাবুর বয়েস অল্প কি না, ভাই পরের জেনানার ওপর লোভটা এখনো মরে নি। ব'লেই সে হা' হা' ক'রে হেসে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে, জনতার ভেতরেও হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল। তারপরেই ভিড় ভেঙে যে যার পথে পা বাড়ালে।

* *
*

* *
*

ঘরের ভেতর প'ড়ে ছিলুম।

দুপুরের রৌদ্র কল্‌কাতা সহরের সাদা দেয়ালগুলোর গায়ে প'ড়ে মরার মুখের বীভৎস হাসির মতো জ্বল্‌ছিল এবং মানুষের দেহেও জ্বালার সৃষ্টি কর্‌ছিল। অসহ্য গরমে ঘরের ভেতরেও কারো সোয়াস্তি ছিল না। এম্‌নি সময় আকাশে মেঘের মাদল বেজে উঠ্‌ল। খুসী হ'য়ে জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখ্‌লুম, কালো কালো মেঘের দৈত্যগুলো শাঁ শাঁ ক'রে ছুটে' আস্‌ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পথের ধূলো ও কাঁকর কুড়িয়ে পাল্লা দিয়ে ছুটে' চলেছে ঝড়ের মতো মত্ত ও ক্ষিপ্ত বাতাস।

হঠাৎ বিদ্যুতের দীপ্তি তার চোখ্-ঝল্সানো তরবারিতে আকাশের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চিরে' দিয়ে গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধ-ভাঙা ঝরণার ধারার মতো ক'রেই নেমে এলো মোটা মোটা বৃষ্টির ধারাগুলো।

এই অতি-ঈপ্সিত ধারার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় কে একজন দৌড়ে সদর দরজা গলিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে' রোয়াকের ওপর উঠে' দাড়ালো।

মুখ তুলে' চাইতেই দেখি, সেদিনের সেই কস্‌রৎওয়ালা জিপ্সী মেয়েটি হাত যোড় ক'রে বল্‌ছে—কসুর মাফ্ করো বাবুজি। জলের ছাটে দেহটা একেবারে ভিজে' গেছে এবং চোখেও এত ধূলো ঢুকেছে যে তাকাতে পারছিনে। ব'লেই সে জোরে জোরে চোখের পাতা দু'টো দু'হাত দিয়ে রগ্‌ড়াতে সুরু ক'রে দিলে।

আমি বল্লুম—আমার কুঁড়েতে এসে যখন দাড়িয়েছ তখন আমার একটা পরামর্শও শোনো। চোখ্ অমন ক'রে রগ্‌ড়িও না—ওতে ব্যথা আরও বাড়্‌বে। তার চেয়ে ঐ ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে চোখ্ দু'টো ধুয়ে' ফেলো।

জলের পাত্রটা হাতে নিয়ে রোয়াকে দাঁড়িয়েই সে চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল। তারপর জলের ঝাপ্‌টায় চোখ্‌ যখন পরিষ্কার হ'য়ে গেল, পাত্রটি পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে একটু মিষ্টি হেসে সে বল্‌লে—বাবুজি, আমি তোমাকে চিনি।

হেসে বল্‌লুম—সত্যি না কি ?

সে বল্‌লে—হ্যাঁ চিনি বই কি। সেদিন কস্‌রৎ দেখাবার সময় আশ্‌মান থেকে নেমে আমি যে তোমার পিঠেই মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

বল্‌লুম– আজ তোমার সঙ্গে সেদিনের সেই বাচাল ওস্তাদটিকে তো দেখ্‌ছিনে।

সে বল্‌লে— ওস্তাদের শেষ কথার খোঁচাটা বুঝি এখনো তোমার বুকে বিঁধে' আছে ! কিন্তু আজ তো কস্‌রৎ দেখাতে বেরইনি যে সে সঙ্গে থাক্‌বে। আজ বেরিয়েছি সওগাত ফিরি কর্‌বার জন্য। ব'লেই সে তার পিঠের ওপরকার প্রকাণ্ড ঝুলিটার দিকে আঙুল নির্দ্দেশ কর্‌লে।

বৃষ্টিতে ভিজে' ঝুলিটে আরো ভারি হ'য়ে তার দেহের সঙ্গে এঁটে ধরেছে। অতখানি ভার ঐ হাল্কা মেয়েটি যে কি ক'রে বয় ভেবে ঠিক করতে না পেরে বল্‌লুম—তোমার বোঝাটা ঐখানে নামাও,—কি আছে ওর ভেতরে ?

সে বল্‌লে—বহুৎ ভারি ভারি জিনিষ আছে বাবুজি—দেখ্‌বে?

বল্‌লুম—হ্যাঁ দেখ্‌ব।

ধীরে ধীরে বোঝাটা নামিয়ে আমার সম্মুখেই ব'সে প'ড়ে তার ধন-দৌলতগুলো সব খুলে' খুলে' সে আমাকে দেখাতে লাগ্‌ল। ধনেশ পাখীর তেল, বাঘের নখ, মৃগনাভি কস্তুরী, উট পাখীর ঠোঁট, এমনিতর আরো কত জিনিষ যে দেখালে তার ইয়ত্তা নেই। সব দেখানো শেষ হ'য়ে গেলে বল্‌লে—কই বাবুজি, তুমি তো আমার কাছ থেকে কোনো একটা জিনিষও সওদা করলে না।

আমি বল্‌লুম—হ্যাঁ করব বই কি। তোমার সব জিনিষ আমাকে একটা একটা ক'রে দিয়ে তার দাম হিসেব ক'রে বলো দেখি কত হয়।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তারপর সেই হাসির ঝলকটা চোখের কোণে আট্‌কে রেখেই আবার বল্‌লে—থাক্ বাবুজি, কিছু কিন্‌তে হ'বে না তোমাকে। ব'লেই সে তার জিনিষ-পত্রগুলো গোছাতে সুরু ক'রে দিলে।

আমি বল্‌লুম—উঠ্‌ছ যে এক্ষুনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বল্‌লে—বৃষ্টি ধ'রে গেছে, এইবার যে ডেরায় ফির্‌তে হ'বে। এ-সব জিনিষের তো তোমার দরকার নেই। এর পর যেদিন আস্‌ব এমন সব জিনিষ নিয়ে আস্‌ব যা তোমার কাজে লাগ্‌তে পারে।

মেয়েটির যে সহজ সরল ভঙ্গি, দৃঢ়তার সঙ্গে মিশিয়ে তার যে স্নিগ্ধতা সেদিন আমার মনে দাগ কেটেছিল, আজও অনেকক্ষণ ধ'রে তারি মোহ যেন আমার চার পাশ ঘিরেই জেগে রইল। চেষ্টা ক'রেও তাকে মুছে' ফেল্‌তে পার্‌লুম না।

* *
*

* *
*

'পাইল্‌সের' ব্যামোটা হঠাৎ যেন জেদাজেদি ক'রেই বেড়ে উঠ্‌ল। এইমাত্র খানিকটা তাজা টাট্‌কা রক্ত ঢেলে দিয়ে ফিরে' এলুম। শ্রান্ত দেহটাকে কোনো রকমে বিছানার ওপর এলিয়ে দিয়ে চোখ্‌ বুঁজে' প'ড়ে আছি, হঠাৎ এমনি সময় দোরের কাছ থেকে কে ডাক্‌লে—বাবুজি!

চেয়ে দেখি, সেই জিপ্সী মেয়েটি। হেসে বল্‌লুম—এসো।

তার চিরন্তনী হাসির পর্দ্দাটা মুখের ওপরে আরো একটু গাঢ় ক'রে টেনে দিয়ে সে ঘরে ঢুক্‌ল। কিন্তু ঘরে ঢুকে'

তার মুখের সেই অপূর্ব্ব হাসির রেখাটি মিলিয়ে যেতেও দেরী হ'লো না। চোখের পাতা দু'টো একটা করুণ বেদনায় ভিজিয়ে তুলে' সে বল্‌লে—তোমার অসুখ করেছে বাবুজি—ভারি যে কাহিল দেখাচ্ছে তোমাকে ?

বল্‌লুম—হ্যাঁ করেছে একটু—কিন্তু তুমি ব'সো। আজ আবার আমার দরকারের জিনিষগুলো নিয়ে আস্‌তে ভোল নি তো ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—কি অসুখ তোমার ?

আমি বল্‌লুম—অসুখের খোঁজ না-ই বা নিলে। তার চেয়ে বরং দু'টো সুখের কথা বলো, যা তোমারও ভালো লাগ্‌বে, আমারও ভালো লাগ্‌বে।

সে বল্‌লে—কিন্তু আমি যে না শুনে' মোটেই শান্তি পাচ্ছিনে। ব'লেই সে ধীরে ধীরে আমার মাথার কাছটিতে ব'সে পড়্‌ল। তারপরে অকস্মাৎ আবার জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল—বাবু, তুমি যে একলা থাকো—তোমার আপনার জন কেউ নেই ?

—আছে, কিন্তু আমি তাদের আপনার ব'লে মনে করলেও তারা করে না।

ব্যারামের সময় একলা নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথাটা হয়তো

সেই ছু'টো কথার ভেতর দিয়েই ঝ'রে প'ড়ল। ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে বললে—আচ্ছা সে কথা যাক্। এইবার তবে তুমি ঘুমোও। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

আমি বললুম—ঘুম আসছে না। তার চেয়ে বরং এসো তোমার সঙ্গে গল্প করি। তুমি আমাকে তোমার জীবনের কথা বলো। কিন্তু তার আগে বলো, তোমার নাম কি ?

সে বললে—দলের সকলে আমাকে মীনা ব'লে ডাকে।

—বাঃ বেশ মিঠে নামটি তো। এইবার বলো তোমার জীবনের কথা।

—বলবার মতো তো আমার কিছু নেই। সেই একটানা জীবন, কখনো কসরৎ দেখাই, কখনো ফিরি ক'রে জিনিষ বিক্রি করি এবং বিক্রী ক'রে যা পাই সর্দ্দারকে ধ'রে দিই।

বললুম—তোমাকে তো মোটেই জিপ্সীদের মতো দেখায় না—রূপেও নয়, কথাবার্ত্তাতেও নয়!

হেসে সে বললে—তুমি হয়তো তোমাদের দেশের বেদেদের সঙ্গে জিপ্সীদের ঘুলিয়ে ফেলছ বাবুজি! খাস ইউরোপের জিপ্সী যারা তাদের ভেতরে আমার চাইতেও

ঢের বেশী সুন্দরীর সন্ধান মেলে। তবে সহবতের কথা যা বল্‌ছ, সেটা হয়তো যে পাদ্রির কাছে আমি মানুষ হয়েছিলুম তারি শিক্ষার ফল।

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—তুমি পাদ্রির কাছে ছিলে?

শুধু ছিলুম না, জীবনের সাত আটটা বৎসর আমার তারি আশ্রয়ে কেটে গেছে। পাদ্রিটা যে আমাকে খুব বেশী ভালোবাসত তা নয়, তবে কর্ত্তব্যের দিকে তার মন অসাধারণ রকমে কড়া ছিল। তাই অনুগ্রহের আশ্রয়েও শিক্ষাটা বাদ পড়েনি। তারপর এরা আমাকে জিপ্সী ব'লে জান্‌তে পেরে তার কাছ থেকে চুরি ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে।

আবার তাকে কি প্রশ্ন কর্‌তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু এবার সে আমার ঠোঁটের ওপর দু'টো আঙুল চাপা দিয়ে বল্‌লে—কিন্তু তুমি এইবার থামো, দুর্ব্বল শরীরে আর অত কথা বল্‌তে হ'বে না।

তারপর এই মমতাময়ী রমণীটির স্পর্শ, তার সেবা আমার বুভুক্ষু দেহ-মনের ওপর ঝর্ণার জলের মতো ক'রে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সেই ঝর্ণার তলে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো চোখ্ বুঁজে' আমি স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে' রইলুম।

কতক্ষণ যে ও-ভাবে প'ড়ে ছিলুম মনে নেই। যখন চোখ্ মেললুম তখন শরীরের গ্লানি ঢের হাল্কা হ'য়ে গেছে। চেয়েই দেখি, আমার মুখের ওপর ভোরের শুক-তারাটির মতো তার দু'টি চোখের দীপ্তি মেলে দিয়ে সে তখনো ব'সে আছে।

চোখের সঙ্গে চোখ্ মিল্‌তেই ফাগের রেণুর মতো রাঙা হ'য়ে উঠে' মীনা বল্‌লে—বাবুজি, এইবার তুমি শুয়ে থাকো, আমি যাই। ব'লেই আমাকে বাধা দিবার অবকাশ না দিয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আবার চোখ্ বুজে' চুপ ক'রে প'ড়ে আছি। মনের ভেতর দোলা দিচ্ছে এই অদ্ভুত মেয়েটির রূপ—তার সেবা—তার কথা। মনের অতল গহ্বরটিতে তলিয়ে এর রহস্য ভেদ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লুম। কিন্তু দুর্বল মাথা সে অনুসন্ধানে সাড়া দিলে না। কেবল ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো চিন্তার ভেলাগুলো নিজেদের খেয়াল মাফিক এখানে ওখানে সেখানে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল।

ঘণ্টা খানেক পরে দেখি, মীনা আবার হঠাৎ এসে ঘরে ঢুক্‌ল। এবার সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে

একটু মিষ্টি হেসে বল্‌লে—আমার কথা এর পরে ভাব্‌লেও চল্‌বে বাবুজি,—তার আগে এই ওষুধটুকু জল দিয়ে খেয়ে ফেলো।

বল্‌লুম—তোমার কথাই যে ভাব্‌ছিলুম, কে বল্‌লে?

মীনা হেসে উত্তর দিলে—জিপ্সী যে গুণ্‌তে জানে তাও বুঝি জানো না। কিন্তু কথা ক'য়ে আর দেরী ক'রো না। নাও—মুখে জল নাও।

বেদের ওষুধ মুখে দিতে মনের ভেতরটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল: বল্‌লুম—ওষুধ ঢের খেয়েছি মীনা—কিছুই হয় নি। সুতরাং ও থাক্।

হেসে মীনা উত্তর দিলে—বুঝেছি বাবুজি, আজানা লোকের ওষুধ খেয়ে পাছে উপকারের চাইতে অপকার বেশী হয়, তাই সাহস পাচ্ছ না। কিন্তু এ ওষুধ যে তোমাকে খেতেই হ'বে। বিশ্বাস ক'রে কিছুক্ষণের জন্য প্রাণটা না হয় আমার হাতেই ছেড়ে দিলে! তারপর একটু থেমে আবার বল্‌লে—বেইমানী ক'রে আমার তো কোনো ফয়দা নেই। বেদেদের হাতেও এমন অনেক জিনিষ থাকে যা আবিষ্কার করতে তোমাদের পণ্ডিতদের এখনো ঢের দিন লাগ্‌বে।

লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লুম—আচ্ছা দাও।

জল দিয়ে ওষুধটা গিলে' ফেল্‌তেই মীনা আবার বল্‌লে —আই-বুড়ী এ ওষুধে অনেককে ভালো করেছে। চোখের ওপর তাদের ভালো হওয়া দেখেছি, তাই তো তোমাকে জোর ক'রে খাওয়ালুম। নইলে জ্ঞান থাক্‌তে তো তোমাকে যে সে ওষুধ খাওয়াতে পার্‌তুম না।

এই অভিনব মেয়েটির পানে চেয়ে এইবার আমার চোখের কোলে জলের রেখা চক্‌ চক্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

* *
*

* *
*

জানালায় ব'সে পথের পানে চোখ্ দু'টো ফেলে দিয়ে মীনার প্রতীক্ষা কর্‌ছি। রোদের ঝাঁঝ্ আজও আবার আগুনের ঝাঁঝের মতোই কড়া হ'য়ে উঠেছে। বাতাস তেতে দূরের মাঠটা ধোঁয়ার মতো ধূ ধূ কর্‌ছে। মরুভূমি হ'লে ও জিনিষটাকে অনায়াসে মরীচিকা ব'লে চালিয়ে দেওয়া যেত।

এই দুপুরেই মীনা আসে, আর সেই সন্ধ্যা নাগাদ উঠে' যায়—এমনি ভাবে এ ক'দিন কেটেছে। কিন্তু আজ এতক্ষণও তার দেখা নেই।

পাঁকের ফুল

কি হ'লো তাই ভাব্ছি, আর এলে কথার শাণিত বাণগুলো একটার পর একটা কেমন ক'রে তার গায়ে ছুঁড়ে' মার্ব মনে মনে তারি তালিম দিচ্ছি, এমন সময় দূরে পথের মোড়টাতে একটা মানুষের ছায়া পড়্ল। এতদূর হ'তেও চিন্লুম যে সে মীনা ছাড়া আর কেউ নয়।

ধীর কাতর পা দু'টো সে কোনো রকমে টেনে তু'লে যেন এগিয়ে আস্ছে। তার মন্থর গতিটাও আমার ভালো লাগ্ল না। তাই ঘরে এসে ঢুক্তেই অভিমানে সুরটা ভারি ক'রে বল্লুম—এলে যে, এতক্ষণে মনে পড়্ল?

উত্তরে সে শুধু একটু হাস্লে, সে হাসিটাও এত ম্লান যে তা যেন তার কান্না ব'লেই মনে হ'লো। চোখের কোণেও জলের রেখা জেগে রয়েছে। পদ্মের ওপর শীতের দিনের শিশির পড়্লে যেমন দেখায় তাকে দেখাচ্ছে সেই পরিম্লান শতদলের ঝ'রে পড়া পাপ্ড়িগুলোর মতো।

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্লুম—কি হয়েছে তোমার, এত ম্লান দেখাচ্ছে যে তোমাকে?

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সে শুধু পিঠের কাপড়টা তু'লে' ধর্লে। দেখ্লুম, সোণার পাতের ওপর কে যেন নীল কালীর কতকগুলো বিশ্রী বীভৎস রেখা টেনে দিয়েছে।

ত্রস্তে তার দেহটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লুম—এ কি! এ যে চাবুকের দাগ—চাবুক মার্লে কে তোমাকে ?

মীনা বল্লে—সর্দ্দার।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কেন ?

এ ক'দিন স্রেফ কিচ্ছু কামাই না ক'রে আড্ডায় ফিরেছি ব'লে। আজও যাতে আবার খালি হাতে না ফিরি সেই জন্য পিঠের ওপর এই লাঞ্ছনার চিহ্নগুলো লাভ করেছি।

ধীরে ধীরে সেই লাঞ্ছনা-বিদ্ধ পিঠের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বল্লুম—তবে ও-রকম ডাকাত সর্দ্দারের কাছে থাকো কেন ?

সে উত্তর দিলে—তা ছাড়া আমাদের আর থাক্‌বার স্থান কোথায় ? সব সর্দ্দারই যে একই ছাঁচে ঢালা বাবুজি!

মীনাকে আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে বল্লুম—আমি যদি স্থান দিই নেবে ?

প্রশ্নটার ভেতরের অর্থটা ধরতে না পেরেই হয়তো সে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আমি সে দিকে লক্ষ্য না ক'রেই বল্লুম—আমি

তোমাকে ভালোবাসি মীনা, আমি তোমাকে সাদি করতে চাই।

চেয়ে দেখ্‌লুম—তার মুখে অকস্মাৎ আনন্দের এমন একটা উচ্ছ্বসিত দীপ্তি জেগে উঠ্‌ল যে, মনে হ'লো এই মুহূর্ত্তেই বুঝি তা তার সমস্ত দেহটাতে আগুন ধরিয়ে দেবে। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্যে। তারপরেই সে দীপ্তি ম'রে গিয়ে সমস্তটা মুখ তার ব্যথার দুঃসহ আঘাতে যেন মরা-মানুষের মুখের মতো রং হারিয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

তার সে মুখের পানে চেয়ে আমি আর একটি কথাও বল্‌তে পার্‌লুম না। আপনাকে ধীরে ধীরে সম্বরণ ক'রে নিয়ে মীনাই বল্‌লে—বাবুজী, আমি পথের ভিখারী। কিন্তু তবু আমাকে এ-রকমের নিষ্ঠুর ঠাট্টাটা না করলেও পার্‌তে। এতে তো তোমার কোনো গৌরব নেই।

তার হাতটাকে হাতের মুঠোর ভেতরে ধ'রে রেখেই বল্‌লুম—ঠাট্টা নয় মীনা, সত্যি কথাই বলেছি। দেখ্‌ছ তো সংসারে আমি ভারি একা। মনের দিক দিয়েও আমি তোমাদেরই মত কতকটা বেপরোয়া লোক। সমাজের বাঁধনকেও আমি মানিনে। সুতরাং তোমার সংশয়ের কারণ কি আছে? তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবার

বল্লুম—আমার দিক থেকে এ বিবাহে তো কিছু বাধে না, তবে যদি তোমার হৃদয় এর আগে আর কোথাও বিকিয়ে গিয়ে থাকে সে স্বতন্ত্র কথা। আমি জানি, এ-সব ব্যাপার নিয়ে জোর-জবরদস্তি করা চলে না।

এবারেও মীনা কোনো কথা বল্লে না। কেবল তার মুখটা ধীরে ধীরে আমার বুকের 'ওপর নেমে আস্‌ল। এবং সেই বুকের 'ওপরেই তার চোখের জল ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে ঝ'রে প'ড়ে যে বন্যার সৃষ্টি করলে তাতে বুক তো ভেসে গেলই, মনের মাঝিও সেই অথই পাথার দরিয়ায় তার তরী ভাসালে। এ বন্যা যে মানুষের দুঃখের অশ্রু দিয়ে তৈরী হয় না তা বুঝ্‌তে আমার এতটুকুও দেরী হ'লো না।

* *
*

* *
*

ভোরের আকাশে শুকতারাটা তখনও জ্বল্‌ছিল। শিয়রের দিকের জানালাটা খুলে' দিতেই সেই শুকতারা হ'তে খানিকটা আলো ঠিক্‌রে প'ড়ে আমার ললাটে চুম্ খেয়ে যেন বল্‌লে—গৃহলক্ষ্মী ঘরে আস্‌ছে, কিন্তু তোমার আয়োজন যে এখনো অসম্পূর্ণ হ'য়েই রইল।

তাড়াতাড়ি বিছানা হ'তে লাফিয়ে উঠে' নিজের মনে মনেই ব'লে ফেল্‌লুম—সত্যই তো। এখনও তো মীনার ঘর সাজাবার কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি!

হাত মুখ ধু'য়ে, কাগজ-পেন্সিল নিয়ে ব'সে গেলুম কি-সব জিনিষ চাই, তারি ফর্দ্দ করবার জন্যে। ফর্দ্দ শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়্‌লুম। তারপর কতক প্রয়োজনীয় কতক অপ্রয়োজনীয় জিনিষে গাড়ী ভর্ত্তি ক'রে যখন বাড়ীতে ফিরলুম তখন বেলা একটা বেজে গেছে।

ঘরে ঢুকে'ই দেখি মীনা আমার বালিশটা বুকের ভেতর টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদ্‌ছে এবং সেই

কান্নার বেগে তার দেহটা তেমনি ক'রে ফুলে' ফুলে' উঠ্‌ছে যেমন ক'রে জোয়ারের জল বেলা-ভূমির বাঁধের ওপর বাধা পেয়ে ফুলে' ফুলে' উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে।

বিস্মিত হ'য়ে তার মাথাটা তাড়াতাড়ি কোলে তুলে' নিয়ে বল্লুম— ব্যাপার কি—অমন ক'রে কাঁদ্‌চ যে?

মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে মীনা বল্লে— ও কিছু নয়—অমনি! কিন্তু এই রুগ্ন দুর্ব্বল দেহ নিয়ে এত রৌদ্রে কোথায় বেরিয়েছিলে তুমি? তোমার নাওয়া খাওয়া হয়েছে তো!

আমি বল্লুম—না, নাওয়া-খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। কারণ এ-ঘরে যে লক্ষ্মীর আগমন হ'বে তারি ঘর সাজাবার সওগাত কর্‌তে বেরিয়েছিলুম। জিনিষগুলো কেমন হয়েছে দেখ্‌বে এসো।

মনে হ'লো চোখ্ দু'টো তার আবার একটা আকস্মিক ব্যথায় যেন ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—ও সব রেখে তুমি চট্ ক'রে স্নান সেরে' খেয়ে নাও দেখি। তোমার খাওয়া শেষ হবার আগে আমি আর তোমার কোনো কথা শুন্‌ছিনে। ছিঃ ছিঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি। দেহের ওপর এতটুকু মায়া নেই তোমার। এই সে দিন অত বড় একটা অসুখ গেছে—এরি মধ্যে আবার অনিয়ম

সুরু ক'রে দিয়েছ! ব'লেই জোর ক'রে আমাকে স্নানের ঘরে ঠেলে দিয়ে সে বাইরে থেকে দোর ভেজিয়ে দিলে।

স্নানের ঘর থেকেই চেঁচিয়ে বললুম- খাই নি ব'লে তুমি অত ব্যস্ত হ'য়ো না মীনা! অনিয়মের মুখে যে নিয়মের লাগাম পরিয়ে দিতে পারবে, দু'দিন বাদেই সে যখন আসছে তখন এ দু'দিনের অনিয়মে কোন ক্ষতি করবে না আমার।

স্নান সেরে বসবার ঘরে পা দিতেই দেখি, মীনা আমার খাবার সাজিয়ে ব'সে আছে।

হেসে বললুম—গৃহিণীর পদটা এরি মধ্যে অধিকার ক'রে বসেছ দেখছি। কিন্তু নববধূর পক্ষে আমাদের সমাজে এটা যে ভারি বেহায়াপণার কথা তা জানো?

ম্লান কণ্ঠে মীনা বললে—সুযোগ ছাড়তে নেই। কে জানে ভাগ্যে আর কখনো তোমার খাবার কাছে বসবার সুযোগ হ'বে কি না! তা ছাড়া নববধূ এখনো তো হই নি।

আমি বললুম—তা বটে, তোমার কৈফিয়ৎ আছে। কিন্তু তার তো আর দেরীও নেই।

সে কথার কোনো জবাব না দিয়েই সে আমার খাবার খবরদারী করতে লাগল। তারপর খাওয়া শেষ হ'লে

হাতে জল ঢেলে দিয়ে গামছা দিয়ে, মুখ মুছিয়ে দিয়ে ব'ল্লে—এইবার চলো—আমার যা বল্‌বার আছে তোমাকে ব'লে যাই।

আমি বল্লুম—আজ এত সকাল সকাল তোমার যাবার তাড়া যে!

সে বল্লে—ডাক যখন আসে তখন যত শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়া যায় তাই ভালো; তোমার সঙ্গে ভাগ্যটা মিলাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু তা যখন হ'তে পারেই না, তখন মায়া বাড়িয়ে তো আর লাভ নেই।

অত্যন্ত হাল্‌কা ভাবেই সে কথাগুলো ব'লে গেল। কিন্তু দেখ্‌লুম, তার সে হাল্‌কা ভাবটা ঝড়ের আগে আকাশে যে থম্‌থমে একটা গুমোটের ভাব জেগে ওঠে কতকটা তারি মতো। ঝড় যদি জাগে তবে তার বুকটা ফেটে টুটে' চৌচির হ'য়ে যেতেও হয়তো দেরী হ'বে না।

ধীরে ধীরে মীনাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বল্লুম—এ আবার কি ঠাট্টা মীনা! কোনো কারণে কি আমার ভালোবাসার ওপর তুমি আস্থা হারিয়েছ?

আমার বুকের ওপর আপনাকে এলিয়ে দিয়েই সে বল্লে—না গো না, তাহ'লে তো বাঁচ্‌তুম। কিন্তু এ যে ভগবানের অভিশাপ!

কথাটা বুঝ্‌তে না পেরে' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে বল্‌লে—আই-বুড়ীর কাছে আমাদের অদৃষ্ট গোণাতে গিয়েছিলুম। গুণে' সে বল্‌লে—এ বিয়ের ফল কখনো ভালো হ'তে পারে না।

আমার বুকের ভেতর হ'তে মস্ত একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস নেমে এলো। হেসে বল্‌লুম—এই কথা! আমি ভাব্‌ছিলুম, না জানি আর কি! তারপর স্বরের ভেতর উপহাস এবং অবিশ্বাস একসঙ্গে মিশিয়ে বল্‌লুম—কার অমঙ্গল হ'বে—তোমার না আমার?

মীনা বল্‌লে—আমার অমঙ্গল হ'লে সে তো আমি গ্রাহ্য কর্‌তুম না, কিন্তু আই-বুড়ী যে দেখ্‌তে পেলে তোমার দেহটাই রক্তের স্রোতের ওপর ভাস্‌ছে।

আমি বল্‌লুম—ছিঃ মীনা, এ-সব কথাও তুমি বিশ্বাস করো। মানুষের ভাগ্য মানুষে গুণ্‌তে পারে, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ছাপ যাদের ললাটে পড়েছে এ ধরণের কথা শুনে' তারা যে কেবলি হাস্‌বে।

মীনা বল্‌লে—হাসুক, কিন্তু তাতে তো সত্যের কোনো ব্যতিক্রম হ'বে না। তোমাদের সভ্যতা কতটুকু সত্যেরি বা সন্ধান পেয়েছে। চোখের ওপর ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ ক'রেই তো জিপ্সীরা ভাগ্য-গণনা করে। তাইতো তাদের

গণনা কখনো মিথ্যা হ'তে পারে না ; তা ছাড়া যদি ভেবে দেখো তবে এ গণনা যে মিথ্যা হ'বে না, তার যুক্তি তোমার নিজের মনেও ধরা পড়বে। জিপ্সীদের প্রতিহিংসা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত মানুষকে ধাওয়া ক'রে চলে। সর্দ্দারের গ্রাস থেকে যদি তুমি আমাকে কেড়ে নাও তবে তোমার বুকের রক্ত ছাড়া তার প্রতিহিংসার আগুন যে নিবুবে না, সে কথা তুমি না জানতে পারো, কিন্তু আমি তো জানি। তোমার ভালোবাসা আমাকে অন্ধ ক'রে না রাখলে এ কথা আমি আরো অনেক আগেই বুঝতে পারতুম। কিন্তু যে অপরাধ করেছি তার জের টেনে চলায় তো কোনো লাভ নেই।

যুক্তির পর যুক্তির জাল রচনা ক'রে চললুম মীনার মনের কুসংস্কারটাকে ভাঙবার জন্যে। কিন্তু সে বুঝবে না ব'লেই বেঁকে বসল এবং এই বাঁকা মীনাকে কিছুতেই সোজা করতে পারলুম না। অবশেষে অসহিষ্ণু হ'য়েই ব'লে বসলুম—আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা যদি সত্য হ'তো তবে এই বাজে যুক্তিগুলো কখনো এমনভাবে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে পারতে না। প্রেমের পানপাত্রটা ঠোঁটের আগে তুলে' ধরবার আগেই যদি শুকিয়ে যায় তবে সোজাসুজি সেই কথাটা বলাই তো ভালো। মিথ্যা

ছল খুঁজে' কৈফিয়ৎ রচনা করবার তো কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার কথা শুনে' মীনার দেহটা থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্তে লাগ্ল—মনে হ'লো আগ্নেয় গিরির গহ্বরটা এই মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে আগুনের হল্কা বেরিয়ে আস্বে। কিন্তু তার কিছুই হ'লো না। ধীরে ধীরে আপনাকে শক্ত ক'রে তুলে' মীনা বল্লে—সত্যি বাবুজি, বুনো জিপ্সি বুনো ঘোড়ার মতোই বেয়াড়া। বাধা পড়্বার ভয়েই সে আৎকে ওঠে। সুতরাং ঘরের ভেতর তাকে বাধ্বার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। কয়েকটা দিনের জন্য এই বিড়ম্বনা যে তোমাকেও ভোগ করতে হ'লো সেজন্য আমাকে মাফ ক'রো। ব'লেই সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অভিমানে আমার সারা দেহ তখন কাঠ হ'য়ে উঠেছে। তাই বাধা দিলুম না, বাধা দেবার শক্তিও ছিল না। ঘরের চারদিক ঘিরে' যখন আগুন লাগে, হতবুদ্ধি গৃহস্বামী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েই তার সর্ব্বস্ব ধ্বংসের ছবিটা দেখে যায়—বাধা দিতে পারে না।

* *
*

* *
*

সন্ধ্যার সীমন্তের সিন্দুরের রেখাটা খানিক আগেই অন্ধকারের আঁচলে ঢাকা প'ড়ে গেছে। কেবল বহুদিনের শুকানো ফুলের মালার মতো তার ছায়াটা পশ্চিমের দিগন্তে তখনও একটু ঝুলে' ছিল।

ঘরের ভেতর স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি। চাকরটা আলো নিয়ে এলো। দরকার নেই ব'লে তাকে ফিরিয়ে দিলুম। মনের যত দূর পর্যান্ত দেখা যায়, হাহাকারের মরুভূমিটা যেন হা ক'রে প'ড়ে আছে।

উৎসবের আলো জ্বল্‌ল, বাঁশী বাজ্‌ল, চিত্তের শেষ প্রান্ত অবধি অজানা স্বরের পুলকে দুলে' উঠ্‌ল, অবশেষে উৎসবের দেবতার রথও এসে পৌঁছালো। কেবল রথের ভেতরকার দেবতাকে মন্দিরের ভেতর প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌লুম না!

আজ চার দিন ধ'রে সহরের রাস্তায় রাস্তায় মীনার খোঁজে ছন্নছাড়ার মতো ঘু'রে বেড়িয়েছি—কিন্তু খোঁজ

পাই নি। ব'সে ব'সে জীবনের এই দু'টো দিনের স্বপ্নের কথাই ভাব্‌ছিলুম, এম্‌নি সময় হঠাৎ উল্কার মতো মীনা ঘরে ঢুকে' আমার বুকের ওপরে একেবারে ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

চোখের কোল দু'টো জলে জলে ভিজে' উঠ্‌ছিল—আর্দ্র কণ্ঠে ডাক্‌লুম—মীনা!

চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো দিয়ে আমার মুখ চেপে ধ'রে মীনা বল্‌লে—চুপ। তারপর আর একটা আঙুল তুলে' পথের দিকে নির্দ্দেশ করলো।

চেয়ে দেখি, কয়েকটা ঘোড়ার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে জিপ্সীর দল রাস্তা পাড়ি দিচ্ছে। দলের শেষ লোকটা পর্য্যন্ত যখন রাস্তার অন্ধকারে মিশে গেল, মীনা বল্‌লে—এ সহরে আমাদের বাসের মেয়াদ শেষ হ'য়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—ওরা কোথায় যাচ্ছে?

মীনা বল্‌লে—ডেরা ফেল্‌বার এক মুহূর্ত্ত আগেও তো জিপ্সীরা জানে না, কোথায় তাদের তাঁবু পড়্‌বে।

দু'হাতে মীনাকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে বল্‌লুম—ওরা যায় যাক্‌ মীনা, কিন্তু তোমার যাওয়া হ'বে না। ভাগ্য গুণে কে কি বলেছে তাই শুনে' আমাকে এমনি ক'রে দুঃখের পাথারের ভেতর ভাসিয়ে দিয়ে যাবে!

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে মীনা আমার বুকের কাছটাতে আরো নিবিড় হ'য়ে ঘেঁসে এলো। তারপর তার নিজের বুকের ভেতর হ'তে একটা আংটি বা'র ক'রে প্রথমে কপালে ঠেকালে, তারপর আমার হাতে পরিয়ে দিয়ে বল্‌লে - মা'র কাছ থেকে আংটিটা পেয়েছিলুম, মন্ত্র-পড়া আংটি। এটা কাছে থাক্‌লে কোন বিপদ কাছে ভিড়্‌তে পার্‌বে না। আমার শপথ রইল, আংটিটাকে কখনো কাছ-ছাড়া ক'রো না। ব'লেই দু'টো ঠোঁঠ দিয়ে আমার চোখে মুখে বুকে যেখানে সেখানে একেবারে পাগলের মতো চুমোর পর চুমোর বৃষ্টি বর্ষণ করতে সুরু ক'রে দিলে।

একটা অজানা আবেগে দেহটা শিথিল হ'য়ে এলো এবং হাত দু'খানাও এলিয়ে পড়্‌ল। সেই সুযোগে আল্‌গা পেয়েই যেমন উল্কার মতো মীনা ঘরে ঢুকেছিল—তেমনি উল্কার মতো ক'রেই ছুটে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে' পথে বেরিয়ে ডাক্‌লুম মীনা! সাড়া পেলুম না। ছুটে' জিপ্সীদের দলটার ওপরেও চোখ্ বুলিয়ে এলুম—সেখানেও সে নেই।

সাম্‌নের হিম-দেহ বিরাট অজগরের মতো রাস্তাটা হাত তুলে' আমাকে ডাক দিলে। জানি না এ রাস্তা

কোথায় শেষ হ'য়েছে। হয়তো পাতাল ফুঁড়ে' রসাতলের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্তই নেমে গেছে। তবু এই রাস্তা ধ'রেই ছুটে' চল্লুম ঐ জিপ্সীদের দলটার মতো যারা জানে না কোথায় চলেছে—কবে তাদের যাত্রা শেষ হ'বে। স্বর্গে তো পৌছাতে পার্লুমই না, যদি রসাতলের শেষ প্রান্তটা ছুঁয়ে' আসা যায় সেই বা মন্দ কি!

শ্রান্ত দেহটা পথের পাশে অবসাদেই হয়তো এলিয়ে পড়েছিল। যখন জাগ্‌লুম, ভোরের প্রথম আলোটা আমার মুখের ওপরে তখন মীনার মৃদু স্পর্শের মতোই লুটিয়ে পড়েছে। সেই ভোরের আলোতে মীনার আংটিটি চোখের সাম্‌নে তুলে' ধর্‌তেই মনে পড়্‌ল—বুকের ওপরে লুটিয়ে-পড়া মীনার চুমোর কথা। সে তো চুমো নয় চুমোর ঝড়। প্রলয়ের ভেতর দিযেই যেমন নতুন সৃষ্টির প্রসবের ব্যথা জেগে ওঠে, চিরবিচ্ছেদের ভেতর দিয়েই তেমনি আমাদের চির মিলনের সেতুটা গ'ড়ে উঠ্‌ল।

অপরিচিতা

অপরিচিতা

সকালের রৌদ্রের ভেতর তখনো আগুনের অসহ্য জ্বালাটা জেগে ওঠে নি! তবু আজ্‌কের দিনটা যে বিশেষ স্নিগ্ধভাবে কাটবে না, এই প্রভাতেই তার পরিচয়টাও একেবারে অস্পষ্ট ছিল না। বেলা মোটে সাত্‌টা। কিন্তু এরি ভেতর আকাশের দিকে তাকিয়েই বুঝ্‌তে পার্‌লুম, ওখানে রৌদ্রের যে শুষ্ক রুক্ষ হাসিটা জ্বল্‌ছে, সে যদি এম্‌নি ভাবেই বাড়্‌তে থাকে তবে সে আজ রাস্তার পাথরে আগুন ছোটাবে, য়্যাস্‌ফাল্‌ট-গুলোকে গালিয়ে

তাদের আদিম অবস্থায় টেনে আন্‌বে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মানুষকে তো ঘরের ভেতর আট্‌কে রাখ্‌বেই—পথের মানুষকেও পথে বেরুতে দেবে না।

পথে ট্রেণটা অকারণে 'লেট' হ'য়ে গেল। রাণাঘাট আর নৈহাটির মাঝখানে একখানা মালগাড়ীর সঙ্গে একখানা যাত্রী-গাড়ীর কলিশন হ'য়ে গেছে রাত দু'টোয়। তার ফলে রাস্তা জাম হ'য়ে গিয়ে এই বিভ্রাট বাধিয়ে ফেলেছে।

ষ্টেশন-মাষ্টারের টুপি-পরা, জামায় রূপোর গিল্‌টী-করা বোতামওয়ালা একজন ভদ্রলোককে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—কেন কলিশন হ'লো মশায়?

তিনি বল্‌লেন—পয়েণ্টস্‌ম্যানের দোষে।

রাত দু'টোয় লোকটার চোখে হয়তো একটু ঝিমুনি এসেছিল—তাই এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল।

ফের জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—কত লোক মারা গেছে?

তিনি বল্‌লেন—লোক তো মারা যায় নি।

বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লুম—তবে এতক্ষণ গাড়ী এখানে প'ড়ে রয়েছে কেন?

তিনি বল্লেন—লোক্ মরে নি বটে কিন্তু অনেক-গুলো গাড়ী একেবারে ভেঙে রাস্তার ওপরে প'ড়ে জট্ পাকিয়ে আছে, তাদের না সরালে গাড়ীই বা চল্বে কি ক'রে?

মনে মনে ভাব্লুম তা বটে। কাঠ ও লোহা-লক্কড়ের গাড়ীগুলোই দুমড়ে, মুচ্ড়ে, ভেঙে তচ্নচ্ হ'য়ে যায়, কিন্তু রক্ত-মাংসের মানুষগুলোর হাতও ছেঁড়ে না, পা'ও কাটে না, প্রাণটাও তাদের যথাস্থানেই আসর জাঁকিয়ে ব'সে থাকে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্লুম—পাশের মেয়েদের গাড়ী থেকেও একটি তরুণী তাঁর মুখ বা'র ক'রে দিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর সে দৃষ্টির ভেতর দিয়েও প্রসন্নতার ঝরণা ঝর্ছে না। হঠাৎ পাশে এসে তাঁর সঙ্গের ভদ্রলোকটি দাঁড়াতেই তিনি বল্লেন—ব'লেছিলুম তখনই—বেস্পতিবারের বারবেলায় বেরিও না, অনেক দুর্ভোগ ভুগ্তে হ'বে। কেমন এখন হ'লো তো?

ভদ্রলোক কি বল্লেন বুঝ্তে পার্লুম না। কিন্তু মনের ভেতর জেগে উঠ্ল আর একটা দিনের এম্নি ধারার নিষেধের কথা। তখন প্রলয়ের খাতায় নাম লিখে' মৃত্যুর

পথে বেরিয়ে পড়েছি। দলপতি রিভল্ভারটা হাতে গুঁজে' দিয়ে বল্‌লেন—আজই তোমায় বেরিয়ে পড়্‌তে হ'বে। কোথায়—কেন জিজ্ঞাসা ক'রো না, ষ্টেশনে গিয়ে পরেশের কাছে সব জান্‌তে পার্‌বে।

কোনো প্রশ্ন কর্‌তে পার্‌লুম না, কারণ আমাদের মনের ভেতর কোনো রকমের কৌতূহল থাক্‌তে নেই। বাড়ীতে ফিরে' বিদায় নেবার সময় মাকে প্রণাম কর্‌তেই তিনি বল্‌লেন—আজ বেস্পতিবারের বারবেলা প'ড়ে গেছে। সুতরাং তোর তো আজ কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না অমল!

মনে মনে হেসে ভাব্‌লুম—ঝড়ের সাথে তুড়ি বাজিয়ে যার চলার পথ, মৃত্যুকে হাতে ক'রে তুলে' দিতে ও হাতে ক'রে তু'লে নিতে যার এক লহমা দেরী করা চল্‌বে না তার কাছে আবার বেস্পতিবারের বারবেলা! মার পা'র ধূলো মাথায় তু'লে নিয়ে বল্‌লুম, থাক্‌বার তো শক্তি আমার নেই মা। কিন্তু তুমি যদি আশীর্ব্বাদ করো, তবে ঐ বারবেলাই আমার পথে মাহেন্দ্রযোগের শুভ ও ধ্রুবকে টেনে নিয়ে আসবে।

সেদিনকার যাত্রা শুভ হ'য়েছিল কি অশুভ হ'য়েছিল কালের কষ্টিপাথরে তার দাগ এখনো ঠিক হ'য়ে ধরা

পড়ে নি। আজও আবার সেই বৃহস্পতিবারের বারবেলা! মনটা হঠাৎ যে কোথায় ছড়িয়ে পড়্‌ল ঠিক পেলুম না। কিন্তু ধ্যান যখন ভাঙ্‌ল দেখি, ট্রেণ শিয়ালদ ষ্টেশনে এসে পৌঁছে' গেছে।

ঘড়ি খুলে' দেখ্‌লুম ন'টা। যেখানে ভোর চা'রটায় পৌঁছবার কথা সেখানে পৌঁছতে ন'টা বেজে গেছে দেখেই মনটা অত্যন্ত খিচ্‌ড়ে গেল।

ভেবেছিলুম, কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে আজই আবার কল্‌কাতা থেকে লম্বা পাড়ি দেবো। কিন্তু প্রাতঃকালটা তো পৌঁছতেই কেটে গেল—রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে দুপুরটাও যে অকাজেই কেটে যাবে সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ রইল না।

বিরক্তি-ভরা মন নিয়ে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুর্‌তেই দেখি, মোড়ের ওপরেই ফুটপাথের খানিকটা যায়গা দড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা, আর তারি ভেতরে কয়েকটা গোরা সেপাই দিব্যি আরামে হাত-পা ছড়িয়ে প'ড়ে আছে এবং কয়েকটা বন্দুক আড়া-আড়ি ভাবে একটার গায়ে আর একটা ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে তাদের পাহারা দিচ্ছে।

পাঁকের ফুল

চিরদিনের অভ্যাস মতো একান্ত অন্যমনস্কভাবেই পথটা পাড়ি দিচ্ছিলুম। হঠাৎ এদের দেখে তড়াক্ ক'রে মনে প'রে গেল, খবরের কাগজে-পড়া কল্‌কাতার এ ক'টা দিনের ইতিহাস। অসতর্ক মনটাকে সাম্‌লে নিয়ে পা দু'টোর গতিটাকে একটু দ্রুত ক'রে তুলে' এগিয়ে চল্‌লুম।

ভয় জিনিষটে মনের ভেতর কোনোদিনই খুব বেশী ছিল না। সেইজন্য ছেলেবেলা থেকে ডান্‌পিটে ব'লে আমার একটা দুর্ণামও ছিল। তবু পেছন থেকে ছোরা চালিয়ে 'সহীদ' হবার সুযোগটা কেউ কিনে' না নেয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছিলুম। হঠাৎ মির্জ্জাপুরের মোড়টা পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে আস্‌তেই পা দু'টো থম্‌কে দাঁড়ালো। সাম্‌নেই চেয়ে দেখ্‌লুম, একখানা মোটরের চা'রপাশ ঘিরে' পনেরো বিশ জন লোক হল্লা সুরু ক'রে দিয়েছে। পাশ কাটিয়ে স'রে পড়্‌বার মৎলব কর্‌ছি, এম্‌নি সময় হঠাৎ নারী-কণ্ঠের চীৎকারে সে সঙ্কল্প আমার এক মুহূর্ত্তে কোথায় যে মিলিয়ে গেল টেরও পেলুম না। পা দু'টোও মোটরখানার সাম্‌নে গিয়েই একবারে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল।

চেয়ে দেখি, একটি মেয়ে গাড়ীর পা-দানের কাছে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। বয়স তার ষোল সতেরোর বেশী হ'বে না। বড় বড় কালো দু'টো চোখের ভেতর অসহায় বেদনার সে কি করুণ চাহনি! সে চাহনি একবার যেখানে পড়ে সেইখানেই যেন বিঁধে' থাকে। গোলাপের দলের মতো পাৎলা দু'টো ঠোঁট রক্ত হারিয়ে একেবারে মরার দেহের মতো সাদা হ'য়ে উঠেছে।

শোক এবং ব্যথার এই মূর্ত্ত প্রতিমাটিকে দেখে কেউ যে এর ওপর অত্যাচার করতে পারে এ কথা কখনো বিশ্বাস করতে পার্‌তুম না—যদি চোখের ওপর সেই অত্যাচারের দৃশ্যটা না দেখ্‌তুম। যে লোকটা জোর ক'রে গাড়ীর ভেতর থেকে তাকে মাটির ওপর টেনে নামিয়েছে তখনো সে তার কর্ক্কশ বিশ্রী হাত দু'টোকে গুটিয়ে নেয় নি। তার স্পর্শের ভেতর দিয়ে একটা কুৎসিত বীভৎসতা বিদ্যুতের প্রবাহের মতো চারিয়ে গিয়ে মেয়েটার মুখখানাকে যেন আগুনের আঁচে শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মতো পাংশু ও বিবর্ণ ক'রে তুলেছে। দলের সবগুলো লোকের চোখ্ সেই একই রকমের কদর্য্যতায় ছোপানো। 'সেন্‌সাসের' রিপোর্টে না কিসে পড়েছিলুম মনে নেই যে, বাংলার শত-করা নব্বুই জন মুসলমানের দেহেই হিন্দুর রক্ত আছে।

হিন্দুর রক্ত জাত খুইয়েও যে এতটা পাশবিকতার ধাপে এসে নেমে দাঁড়াতে পারে সে কথা মনে হ'তেই হিন্দুর ওপরেও অশ্রদ্ধায় মনটা ভ'রে গেল। হঠাৎ মনে পড়্‌ল গীতার সেই শ্লোকটা যাতে লেখা আছে—স্বধর্ম্মে মরাও ভালো, তথাপি পরের ধর্ম্ম নিয়ো না, কারণ সে ভারি ভয়াবহ। এই ভয়াবহ পর-ধর্ম্ম গ্রহণের ছবিটা চোখের ওপর ফুটে' উঠ্‌তেই শিউরে উঠ্‌লুম।

গাড়ীর ভেতরে চেয়ে দেখ্‌লুম, মেয়েটার চাইতেও জড়-ভরত হ'য়ে ব'সে রয়েছেন একটি ভদ্রলোক। তাঁর সমস্ত মুখের ভেতর দিয়ে একটা ভীরুতার ছাপ, আমাদের জাতীয় চরিত্রের আর একটা দিককেই জীবন্ত ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌ছিল।

ঘৃণায় সমস্ত শরীরটা রি রি ক'রে উঠ্‌ল। কথা বল্‌বারও প্রবৃত্তি হ'লো না। কেবল হাতটা নিজে হ'তে ঘুরে' গিয়ে যে গুণ্ডাটার হাত মেয়েটাকে জড়িয়ে ধ'রে ছিল তার কাণের কাছটাতে এমনি ভাবে স্পর্শ করলে যে সে সঙ্গে সঙ্গেই মাটির ওপর লুটিয়ে পড়্‌ল। তারপরেই ঝাঁ ক'রে মেয়েটাকে গাড়ীর ভেতর ঠেলে দিয়ে গাড়ীতেই পিঠ রেখে দাড়িয়ে বল্‌লুম—ভাই সব,

বন্ধুর অবস্থাতো চোখের ওপরেই দেখ্‌লে। সুতরাং মিছিমিছি এখানে ভিড় পাকিয়ে তোমাদের যে আর বিশেষ কোনো লাভ হ'বে তাতো মনে হয় না। গায়ে যে আমার কতটা জোর আছে তা আমার এই দেহটার দিকে এবং লাঠিতেও যে আমি ওস্তাদ তা আমার লাঠি ধরার কায়দাটার দিকে তাকালেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। সুতরাং যদি প্রাণের মায়া থাকে তো এই বেলাই স'রে পড়ো।

কিন্তু কারো কাণে পৌঁছবার আগেই আমার কথা-গুলো সেই উন্মত্ত জনতার হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের ভেতরে একেবারে নিরুদ্দেশ হ'য়েই হারিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌লুম, আট দশ খানা লাঠি বোঁ বোঁ ক'রে আমার মাথার ওপরে উদ্যত হ'য়ে উঠেছে।

•

এর পর লাঠির সঙ্গে লাঠির লড়াই সুরু হ'য়ে গেল। রক্ত তেতে মনটা তখন মাতালের মতো মত্ত হ'য়ে উঠেছে। দু'তিন মিনিট পার হ'তে না হ'তেই দেখ্‌লুম, দু'তিনটে লোক পথের ওপর শু'য়ে পড়্‌ল।

কিন্তু এ ধরণের অসম্ভব লড়াই যে আর বেশীক্ষণ চল্‌বে না সে কথাও বুঝ্‌তে দেরী হ'লো না। কাফেরের

পায়ের গন্ধ পেয়েই সাম্‌নের মস্‌জিদটা হ'তে ধর্ম্ম-প্রাণ মুশাফেরের দল, পিল্ পিল্ ক'রে বেরিয়ে এসে সেই গুণ্ডাদের দলের সঙ্গে আশ্চর্য্য রকমে এক হ'য়ে মিশে' যেতে লাগ্‌ল। চা'র পাশে কোথাও একটা হিন্দুর মুখ নেই। অথচ হিন্দুর বাড়ী যে আসে পাশে কম ছিল তাও নয়। আজ সত্য সত্যই মনে হ'লো হিন্দুস্থানটা হিন্দুশূন্য হ'য়ে যাওয়াটা অসম্ভব হয়তো নাও হ'তে পারে এবং যদি হয় সেটা হয়তো খুব বেশী রকমের কিছু অন্যায়ও হ'বে না। ক্লীবত্বের প্রায়শ্চিত্ত ধ্বংসের আগুনে জ্ব'লেই সব জাতকে গ্রহণ কর্‌তে হয় এবং বিধাতা নিজের হাতেই এ সব অপরাধের দণ্ড বিধান করেন। তাই ভগবান্ সকলের আগে এবং সব চেয়ে জোরের সঙ্গে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।'

খানিকটা হতাশ হ'য়েই গাড়ীর ভেতরকার ভদ্রলোকটিকে ডেকে বল্‌লুম,—ঠায় পুতুলের মতো চুপ ক'রে ব'সে না থেকে, একখানা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে যদি আমার পাশে এসে দাড়ান, তা হ'লেও আমার বুকে খানিকটা জোর আসে!

কিন্তু সে মূর্ত্তির ভেতরে কোনো রকমেরই ভাবান্তর

দেখা গেল না। মেয়েটি শুধু অশ্রু-ভেজা কণ্ঠে বল্‌লে—কাকে বল্‌ছেন আপনি! ওঁর দ্বারা কোনো সাহায্যের আশা করা, আর এই পথের ধূলোগুলোকে ডেকে লড়াই করতে বলা সে তো একই রকমের কথা।

শেষের দিকের স্বরটার ভেতর দিয়ে যেন একটা ঘৃণার ধিক্কার বৃষ্টির ধারার মতো ক'রে ঝ'রে পড়তে লাগ্‌ল। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই স্বরটা কোমল ক'রে তুলে' আবার বল্‌লে—কিন্তু কেন আমাদের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর ভেতর আপনি ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছেন। আমাদের ভাগ্যে কি আছে জানি। কিন্তু ওটা তো আমাদেরই ন্যায্য প্রাপ্য। আপনার হাতের লাঠিতে জোর আছে, আমাদের ভাগ্যটা ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়েই আপনি আপনাকে বাচান!

শ্রান্তিতে কথা বল্‌তে কষ্ট হচ্ছিল, তবু কণ্ঠটা একটু ঝেড়ে তাজা ক'রে নিয়ে বল্‌লুম—চেষ্টা করলে হয়তো নিজেকে বাচাতে পারি, কিন্তু সেতো হয় না। তোমার অনেক ভাই নিজেদের বোন্‌কে অত্যাচারীর হাতে তুলে' দিয়ে যে মহাপাপ করেছে ম'রে যদি তার এতটুকু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি, তবে তাতেই আমার জীবন সার্থক হ'বে।

মরতে রাজি ছিলুম। কিন্তু মরতে হ'লো না। হঠাৎ ভিড়ের ভেতর হ'তে একটা লোক চীৎকার ক'রে উঠে' বল্‌লে—হুসিবার, ভাই সব! কিস্লে সে শালে গোরা-পল্টন কি ফৌজ একদম নগিচমে আ গ্যায়ে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকের দেহে গিজ্‌ গিজ্‌ করা সেই রাস্তাটা হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে একেবারে ফাঁকা হ'য়ে খালি হ'য়ে গেল। অতগুলো লোক কে যে কোথা দিয়ে উধাও হ'য়ে গেল বুঝে' উঠ্‌তে পারলুম না। আঙুলের ডগা দিয়ে কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা-গুলো ঝেড়ে ফেলে লাঠিটাতে ভর দিয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়াতেই দেখ্‌লুম—একটা ছোট-খাট পল্টনের দল ফাঁকা রাস্তাটা জুতার টক্করে এবং Quick-march এর কস্‌রতে কাঁপিয়ে তুলেছে।

দলটাকে halt-এর হুকুম দিয়ে সেনাপতি সাহেবটি আমাদের কাছে এগিয়ে আস্‌তেই গাড়ীর ভেতরকার ভদ্রলোকটির ভেতর একটা আশ্চর্য্য রকমের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে গাড়ীর ভেতর থেকে লাফিয়ে নেমেই সাহেবটাকে পুরোদস্তুর একটা সেলাম ঠুকে' বল্‌লে—Good morning Sir, you are just in time.

I had an attack from the Mahomedan ruffians. But I tell you Sir, I am quite innocent. Here is my card—I am a servant of his Majesty's Service—a senior...

মিলিটারী সাহেবটা তাকে বাধা দিয়ে একটু উত্তেজিত হ'য়েই ব'লে উঠ্‌লেন—Shut up Babu. কিন্তু তার পরেই কি মনে ক'রে ইংরেজী ছেড়ে ভাঙা ভাঙা বাংলাতেই বল্‌লেন, Ladyদের honour বাঁচিয়ে চল্‌বার মতো সাহস যদি তোমার না থাকে তবে এই দাঙ্গার সময় একজন Ladyকে নিয়ে পথে বেরিয়েছ কেন? 'Tis not a time of usual peace and rest.

ভদ্রলোকটী হেসে বল্‌লেন—ও-কথা ব'লো না সাহেব। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট peace রাখ্‌তে পারে না এতো আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে। এই দেখো না, এখানে কোন্ সময়টাতে যে তোমাদের দরকার তাও তোমাদের ঠিক জানা আছে।

Nonsense! ব'লেই সাহেব তাঁকে ছেড়ে একটু এগিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপরেই তাঁর সাদা মোটা হাতখানা বাড়িয়ে আমার হাতটা তাঁর হাতের ভেতর তুলে' নিয়ে বল্‌লেন—But you are an exception, my

young friend! I saw you fighting. It was grand, nay, marvelous. But you must not go alone. I leave two men to escort you. ব'লেই যেমন চট্‌পট্‌ তারা এসেছিল তেমনি চট্‌পট্‌ ক'রেই তারা চ'লে গেল।

আমিও আমার পথের উদ্দেশে পা বাড়িয়ে দিলুম; হঠাৎ পা'র ওপরে একটা কোমল স্নিগ্ধ প্রলেপের মতো স্পর্শ অনুভব ক'রে নিচের দিকে তাকাতেই চোখ্‌ পড়্‌ল ফুলের মতো অপূর্ব্ব সেই মেয়েটির ওপরে। সে যে কখন আমার পা'র তলায় ব'সে প'ড়ে আমার পা'র ধূলো মাথায় তুলে' নিচ্ছিল টের পাই নি। পা'টা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই সে জোর ক'রে তার মুখটা আমার পা'র ওপরে চেপে ধ'রে বল্‌লে—অমন ক'রে পা যদি আপনি টেনে নেবেন তবে এই পথের মাঝখানেই আমি মাথা খুঁড়ে' মর্‌ব।

গাড়ীর ভেতরকার ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, তাঁর মুখ দিয়ে একটা অস্বাভাবিক বিরক্তি ও হিংসার জ্বালা ঝ'রে পড়্‌ছে। বল্‌লুম—আমি কি জাত তাতো জানেন না। তা ছাড়া আমি নিজে তো করিই না, আপনার

স্বামীও বোধ হয় ঐ প্রণাম জিনিষটা পছন্দ করচেন না।
তবে কেন অনর্থক—

আমার কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই সে বল্‌লে—জাত জান্‌লেও এর চাইতে বেশী কিছু হ'তো না। আমার স্বামীর কথা বল্‌ছেন!—আমি জানি, এ নিয়ে আমার অদৃষ্টে অনেক লাঞ্ছনা আছে, কিন্তু এ প্রণাম না কর্‌লেও যে সে লাঞ্ছনা কিছুমাত্র কম্‌ত তা নয়। তাঁর হাকিমী ক্ষমতা আমাকে রক্ষা করতে পার্‌লে না, অথচ পথের একজন অজানা অচেনা লোক এসে আমাকে রক্ষা ক'রে গেল—এ পরাজয়ের কথা তিনি কখনো ভুল্‌বেন না। কিন্তু সেজন্যে আমি ভাব্‌ছিনে। আপনার পা'র ধূলো আমাকে যে শক্তি দিয়ে গেল, তাতে ওঁর অপমান আমার অনায়াসেই সইবে। তা ছাড়া বাংলার মেয়ের পক্ষে ঘরে বাইরে সমান ভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করা—সে তো কিছু নতুন জিনিষও নয়। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে তার মনের ওপর যে কড়া পড়ে গেছে, তাতে ও-সব আঘাত আর আঘাত ব'লেই মনে হয় না। কিন্তু এ নিয়ে আপনি মিছিমিছি মাথা খারাপ কর্‌বেন না। এইবার আমি তবে আসি। ব'লেই পা'র ধূলো আবার মাথায় তুলে' নিয়ে সে ধীরে ধীরে উঠে' গাড়ীতে গিয়ে বস্‌ল।...

পা'র ধূলো নেবার পালা তো সারা হ'লো। কিন্তু এই যে পথের ধূলো উড়িয়ে অপরিচিতা-তরুণী চ'লে গেল, সে ধূলোর জের কি কখনো কোনো কালে মিটবে আমার কাছে? ধূলোর মাঝে আজ একি আলোর বন্যা নেমে এলো—যাতে আমার চোখ্ তো জুড়ালোই, মনও ভুলে' গেল!

ধূলোগুলোর পানে চেয়ে চেয়ে যে কতক্ষণ কাটিয়ে দিয়েছিলুম মনে নেই, হঠাৎ একটা গোরা এসে বল্লে—Am sorry to disturb you Babu. But we must go now. It will soon be raining.

আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্লুম—দিনের গোড়ায় সূর্য্যের যে দীপ্তি মনের ভেতর অগ্নি-বৃষ্টির ছবিটা এঁকে দিয়েছিল, তা কোথায় মিলিয়ে গেছে, আর তারি যায়গায় সারা আকাশ ছাপিয়ে জেগে উঠেছে কাজলের মতো কালো মেঘের ছায়া। সে ছায়া সেই অপরিচিতা তরুণীর চোখের মতোই যেমন জলে ভরা তেমনি স্নিগ্ধ। দূরে ঐ আকাশেরই প্রান্তে মেঘের মাথায় ফুটে' উঠেছে একটা

অপূর্ব্ব সুন্দর ইন্দ্রধনু। তারি রঙ্‌গুলো জ্বলছে আমার মনের এক একটি পর্দ্দায় এক একটি রঙের রেখা এঁকে দিয়ে। একটা রেখা তার চুলের মতো কালো, আর একটা রেখা তার হাসির মতো সাদা, একটা রেখা আবার তার গোলাপের পাপ্‌ড়ির মতো যে অধর সেই অধরের মতোই লাল।

মনে হ'লো—হায়রে বাংলাদেশ, এ মুক্তো কি তোমার ঐ বানরটার গলায় না ঝুলিয়ে দিলেই চল্‌ত না।

গোরা হু'টোর দিকে তাকিয়ে বল্লুম—তোমরা যাও, আমার সাহায্যের দরকার হ'বে না।

তারা বল্‌লে—সে হয় না বাবু, আমাদের ওপর যে তোমাকে পৌছে দেবার হুকুম আছে।

ওপরের ছাদ থেকে একটি ভদ্রলোক ডেকে বল্‌লেন—এ-পাড়ায় যতক্ষণ আছেন, ওদের বিদায় দেবার কল্পনাও করবেন না মশাই! ওরা আছে তাই আপনার দেহে প্রাণটা এখনও টিকে' আছে, নতুবা যে কাজ করেছেন আপনি, এখান থেকে মাথা নিয়ে যেতে হ'তো না আপনাকে।

হেসে ভদ্রলোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে মনে মনে বল্লুম—এদের প্রতি এই শ্রদ্ধাই তো এদের রাজ্যকে অক্ষয় ক'রে রেখেছে এ দেশের বুকে। এরা যা করলে, পাড়ার

পাঁকের ফুল

দশজন হিন্দু এসে যদি আমার পাশে দাঁড়াত তবে তার ফলও ঠিক এই রকমেরই হ'তো।

তারপর পথের যে-ধূলোর ওপরে তরুণী হাঁটু গেড়ে ব'সেছিল, তারি খানিকটা ধূলো কুড়িয়ে নিয়ে, কাগজের ভাঁজে পুরে' বুকের পকেটে রেখে যে-পথ বেয়ে চ'লেছিলুম সেই পথের স্রোতেই আবার গা ভাসিয়ে দিলুম।

পাহাড়ের মায়া

পাহাড়ের মায়া

রাস্তাটার নাম 'ক্যামেলস্-ব্যাক্-রোড্'। পাহাড়ের এইখানটা উটের পিঠের মতো মাঝখানে উঁচু হ'য়ে দু'পাশে ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে। তাই মানুষের মগজ তার ললাটে নামের এই অপূর্ব্ব তিলকটা পরিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাংলাগুলো ছবির মতো ঝুলে' আছে। কোনোটা দু'শো ফিট ওপরে, কোনোটা বা দু'শো ফিট নীচে। দু'ধারে পত্র-পল্লবের বিচিত্র তোরণ।—তারি মাঝ দিয়ে চ'লে গেছে মৃগোবীর রাজপথ—ঝক্-ঝকে, তক্-তকে, ধূলি-চিহ্নহীন।

পাঁকের ফুল

পাহাড়ের পাথর টেনে এনে আমাদের সহরের রাস্তা তৈরী হয়। সে পাথর মরা পাথর। এখানে তাজা পাহাড়ের বুক কেটে তার ওপর দিয়ে রাস্তা গ'ড়ে তুলেছে মানুষের মনের ভেতর যে ময়দানব আছে তারি শিল্প-সাধনা। কান পেতে শুনলে মানুষের পায়ের ধ্বনির ভেতর দিয়ে খণ্ডিত পাহাড়ের ব্যথিত আত্মার কান্নার গোঙ্ রানিটাও হয়তো শোনা যায়।

পথ ছেড়ে খানিকটা নেমে গিয়ে ফটক গলিয়ে কবর খানার ভেতর ঢুকে' পড়্‌লুম।—কবর তো নয়—পরী-পরীদের নাচ-ঘর। তাদের হাসির রেণুর খানিকটা ছিট্‌কে প'ড়েই বুঝি পাহাড়ের হাওয়ায় জমে' গিয়ে এখানে এক থোকা, ওখানে এক থোকা গোলাপের গুচ্ছ গ'ড়ে তুলেছে। তাদেরি দেহের তাজা তরুণ রক্ত ঝর্‌ছে ডালিয়ার পাপ্‌ড়িগুলোর ভাঁজে ভাঁজে। লতাগুলো নুইয়ে গেছে তাদের চল-চঞ্চল নৃত্যের মতো। সেই নৃত্যের তালে তালে যখন যেখানে কান্না ঝরেছে বা হাসি ফুটেছে, সেইখানে তেমনি হাসির মতো সুন্দর, কান্নার মতো করুণ ফুলও ফুটে' উঠেছে। গোলাপের হাসি, ডালিয়ার কান্না আমার চোখ্‌ ভুলালো, মন জুলালো।

পাহাড়ের মায়া

কবর ছেড়ে 'উটের পিঠের রাস্তা' বেয়ে আবার আমার যাত্রা সুরু হ'লো। রাস্তাটা যেখানে মোড় ঘুরেছে সেইখানটায় রেলিং-ঘেরা বস্‌বার ছোট ঘরটাতে এসে দাঁড়াতেই একটা মিষ্টি হাসির সুর পথ ভোলা মনটাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলে। কবরের পরীগুলো বুঝি আজ পাহাড়ের সব যায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে! চোখ্ তুলে' চাইতেই দেখি, একটি তরুণী হাসির ঝরণা ঝরিয়ে তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

যে যায়গায় তাঁরা ব'সে ছিলেন সেইখানে এসে বেঞ্চিটার ওপর ব'সে পড়লুম। পথে যেতে যেতে মেয়েটি যে চাহনির আলো ছড়িয়ে গেল—সে চাহনির সঙ্গে দূরের ঐ পাহাড়ের ওপর রৌদ্রের যে চাহনিটা জ্বলছে তার আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে। তার হাসির সুরও কানে শুনলুম—সে সুর নীচে অতল অন্ধকারে যে ঝরণাটা পাহাড়ের ওপর থেকে পাহাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তারি পায়ের ঘুঙুরে নৃত্যের যে ঝন্-ঝনানি জেগে উঠেছে—তারি মতো।

অদূরে একটা লাল রঙের বাড়ী দেখা যাচ্ছে—ধূসর পাহাড়ের মাঝখানে যেন একটা দীপ্ত মরকতের দ্যুতি।

পাঁকের ফুল

সবুজের বুকের একান্ত গোপনে যে রক্তের ঝর্‌ণা ঝরে হঠাৎ তারি খানিকটা ছিট্‌কে এসে বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুনের তূলি বুলিয়ে দিয়ে গেছে।

বাড়ীটার দিকে চেয়ে আছি—হঠাৎ মনে হ'লো ওর হাজার চোখ্ লক্ষ ইসারায় ভরা। সে ইসারা যেন আমাকে হাত তুলে' ডাক্‌ছে—এসো, এসো, নেমে এসো, আমার এই অন্তরের মাঝখানে নেমে এসো। রহস্যের রাজপুরীতে মায়ালোকের রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। যে রাজকন্যার কথা তোমরা গল্পে পড়েছ, রূপকথায় শুনেছ, এই তো সেই রাজকন্যার মায়াপুরী। তার রহস্যের সন্ধান যদি পেতে চাও আমার বুকের মাঝখানেই তো তার সন্ধান পাবে।

হায় রে পাহাড়ের মায়াপুরী!—এর পথ ডাকে, লতা-পাতা ডাকে, আকাশ-বাতাস ডাকে, ঘর-বাড়ী ডাকে, ডাকের নিভৃত গুঞ্জরণে মনের পাথারে যে গতি জাগে তাতে পায়ের ক্ষতি খতিয়ে দেখ্‌বারও অবকাশ থাকে না।

ধাপের পর ধাপ নেমে চলেছি। চোখের আগে জাগ্‌ছে শুধু সেই নেশা জাগানো রাজপুরীটি—নিভৃত অন্তরের গোপন কাহিনীর আগুনের ছোঁয়া যার চা'র ধার

ঘিরে' রক্তের রাঙা পাড় পরিয়ে দিয়েছে। আগুনের এমনিতর হাত-ছানিতেই তো পতঙ্গের দল ছুটে' গিয়ে মৃত্যুর শিখার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পথে আবার দেখা সেই মেয়েটির সঙ্গে। উঁচু পাহাড়ের গায়ে এক থোকা নীল ফুল—আকাশের নীলের মতোই রূপে ভরা আলোয় গড়া। নীল রঙের এক থোকা তারা যেন দুল্‌ছে—বাতাসের বুকে সৌন্দর্য্যের দু'কূল-ভাঙা বান ডাকিয়ে।

মেয়েটা হয়তো বা দু'টো ফুল চেয়েছিল—হয়তো বা চায় নি। কিন্তু সাথের পুরুষটি দেখ্‌লুম ফুল ক'টা চয়ন করবার জন্য পথের পাশে পাথরের একটা ছোট-খাট টিলা গ'ড়ে তুলেছেন। টিলের ঘায়ে হঠাৎ একটা বড় পাপ্‌ড়ি ঝ'রে পড়্‌ল।

ব্যাকুল বাহু মেলে সেই পাপ্‌ড়িটি কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি করুণ-কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—থাক্—থাক্—তোমাকে আর ঢিল ছুঁড়্‌তে হ'বে না। সুন্দরের অর্ঘ্য অন্তরের দরদ দিয়ে চয়ন করতে হয়। তা যদি না পারো, তোমার অক্ষমতার দানবটাকে লেলিয়ে দিয়ে সুন্দরের অপমান করবার অধিকারও তোমার নেই।

ধীরে ধীরে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লুম—যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন, তবে সুন্দরের পূজার অর্ঘ্যটি অসুন্দর এই হাত দু'টোই চয়ন ক'রে দিয়ে সার্থক হোক্।

তারপর কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই যে যায়গাটাতে ফুলের তোড়াটি ফুটে' রয়েছে তারি উদ্দেশে পা বাড়িয়ে দিলুম।

রূপকথার রাজকন্যার পণ ছিল—সোনার গাছে যে হীরের ফুল ফোটে সেই ফুল তাঁর চাই। রাজপুত্র কত মরু-কান্তার পেরিয়ে, পাহাড়-সাগর ডিঙিয়ে, মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে ফুল চয়ন ক'রে এনেছিলেন। এ সোনার গাছে হীরের ফুল নয় হয়তো ফুলের দাবী যিনি জানিয়েছেন রাজকন্যার পদবীও তাঁর নেই। কিন্তু পাহাড়ের এই মায়াপুরীর পথে সেই রূপকথার নীলাঞ্জন এসে লাগ্‌ল আমার চোখে, তার পথ-ভোলানো গান ঘা দিয়ে গেল আমার মনের তারের সেই সুরে যে-সুর যুগ-যুগান্ত হ'তে ঘরের মানুষকে পথের পানে টেনেছে, পথের মানুষকে দিয়ে নিরুদ্দেশের পাথার পাড়ি দেবার মন্ত্র জপিয়েছে।

পাহাড়ের মায়া

পথ দুরারোহ হ'য়ে উঠ্‌ল! ফুলের থোকাটার ঠিক নীচে অন্ধকারের একটা গহ্বর। আকাশ-পাতাল ব্যেপে আলিঙ্গনের উদ্যত বাহু মেলে সে দাঁড়িয়ে আছে। একবার তার জমাট্‌ আঁধারের অন্তরাল ভেদ ক'রে কোন্‌ দানবের অট্টহাসের হুল্লোড় হাহাকারের মতো ক'রে ভেসে এলো। সেই হাসির ঝড়ের ঝাঁকুনিতে মাথার ওপরের পাহাড়টা থর-থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌ছে। গতির ছন্দে এক মুহূর্ত্তের জন্যে পা'র তলায় তাল কেটে যাচ্ছিল—হঠাৎ একটা গাছের ডাল ধ'রে ধাক্কাটাকে সাম্‌লে নিলুম।

হে নিরুদ্দেশের যাত্রী দুঃসাহসী রাজপুত্র, যে মোহ তোমাকে দৈত্য-পুরীর পরিখা পেরিয়ে প্রাণের মায়া ভুলিয়ে হীরের ফুলের সন্ধানে টেনে এনেছিল সেই মোহের সঙ্গেই আজ মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষের মনের চিরন্তনী অভিসারিকা আল্‌গা পেয়ে ছুটে' চলেছে দুষ্প্রাপ্যের সন্ধানে দুঃখ-দুর্গতির অফুরন্ত মরু-পথে।—এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো—কে জানে?

ফুলের গুচ্ছটা হাতে নিয়ে নেমে আস্‌তেই দেখি, দু'টি ডাগর চোখের করুণ চাহনি আমার পানে চেয়েই ভেজা

শেফালির দলের মতো উৎকণ্ঠার আবেগে কাঁপছে। এতক্ষণ যে একটিও কথা বলে নি, এইবার সে তার কণ্ঠস্বরের ভেতর মিষ্টি ভর্ৎসনার সুর মিশিয়ে বললে—ভারি ভাবিয়ে তুলেছিলেন আপনি। অনর্থক এত বিপদের পথেও নাকি কেউ পা বাড়ায়।

ফুলের থোকাটা বিদ্যুতের ডগার মতো তাঁর হাতের লতানো আঙুলগুলোর ওপর তুলে' দিতে দিতে বললুম—সার্থকতার মাপকাঠি তো সকলের পক্ষে সমান নয়। কিন্তু আপনি যাকে ভারি বিপদ্ ব'লে মনে করছেন, সে আমার পুরানো বন্ধু। বিপদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ তো চিরদিনই হ'য়ে আসছে, কিন্তু আজ যে আনন্দের সঙ্গে পরিচয় হ'লো তার সাক্ষাৎ জীবনে ক্বচিৎ কখনো পাওয়া যায়।

হঠাৎ আমার হাতের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি একেবারে চমকে উঠল। তারপর হাতখানাকে তাড়াতাড়ি হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বললে—এ কি করেছেন আপনি—জামাটা যে একেবারে রক্তে ভিজে' গেছে!

হাতের দিকে তাকিয়ে আমারও বিস্ময়ের অন্ত রইল না। এ যে কি ক'রে হ'লো তাই ভাবছি—হঠাৎ মনে পড়ল পা'র তলার ছন্দে সেই তাল কাটার কথাটা।

সম্ভবত প্রাণটাকে বাঁচাতে গিয়েই হাতের জখমটাকে খেয়াল করি নি। হেসে বললুম—হয়তো বা কাঁটার একটা আঁচড়, হয়তো বা একটা ছুঁচলো-মুখ পাথরের হুল ফোটানোর চিহ্ন। কি ক'রে যে হ'লো নিজেও টের পাই নি।

ধমক দিয়ে মেয়েটি বললে—দাঁড়ান, টানবেন না হাত। হাসচেন আপনি! মাগো, কি ডানপিটে লোক! চামড়াটা একেবারে দু'ফাঁক হ'য়ে গেছে—তবু ব'লে কি না খেয়াল নেই।—ব'লেই আমার হাতটা তুলে' ধ'রে তরুণী ভালো ক'রে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগল। তারপর হাতের রুমালখানা তখনকার মতো সেই যায়গাটায় চাপা দিয়ে বললে—চলুন এইবার আমাদের বাড়ীতে। আপনার হাতটা ধুয়ে' ভালো ক'রে বেঁধে দিই গে।

মাথা নেড়ে বলতে যাচ্ছিলুম—ও কিছু নয়—কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি। কিন্তু তার অবসর না দিয়েই মেয়েটি আবার ব'লে উঠল—মাথা নাড়লে চলবে না মশায়, এই জখমী হাতটাকে এমনি অবস্থায় রেখে গেলে আমি আজ সমস্ত রাত সোয়াস্তি পা'বো না। খুব বেশী দূরে যেতে হ'বে না আপনাকে। ঐ

সাম্‌নেই যে লাল বাড়ীটে দেখা যাচ্ছে, ওটি এই গরীব-দেরই আস্তানা।

১

সেই লাল রঙের বাড়ীটে—যার হাতছানি আমাকে এই পথের প্রান্তে টেনে এনেছিল। ওর অদৃশ্য ইসারা কেন রহস্যের রঙ্‌ ঝরায় হয়তো কতকটা তার সন্ধান পেলুম—হয়তো বা পেলুম না। কিন্তু মনের মায়াপুরীতে যে-রাজকন্যা রূপোর কাঠির স্পর্শ পেয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, সোনার কাঠির একটা আকস্মিক স্পর্শে সে যে জেগে উঠেছে তাতে আর এতটুকুও ভুল নেই।

* *
*

* *
*

মেয়েটির নাম ইলা। কঠিন শিলার বুকেও যে সৌন্দর্য্যের সমুদ্র দিক্ হারায়, তার পরিচয় পেলুম এই মুশৌরীর আট হাজার ফিট উঁচু পাহাড়টায়, আর উষর মনের মরুতেও যে সৌন্দর্য্য-শতদলের পাপ্‌ড়িগুলো আলো ঝরায় তারও পরিচয় পেলুম ইলাকে দেখে আমার এই নিজেরই মনটাতে। ভগবানের পায়ের ছোঁয়ায় যে-পাষাণ জেগে উঠে' নারীর রূপ দিয়ে পূজার অর্ঘ্য রচনা করেছিল সে হয়তো এই ইলা। ওর চলার বেগে নির্ঝরের গায়ে নৃত্য ঝরে, ওর হাসির আলো সূর্য্যের চুমোয় ঝর্ণার গায়ে যে উৎসব জাগে তারি বুকে দীপ্তি পরায়।

পাঁকের ফুল

এই একটি নারীকেই জীবনে প্রথম দেখ্‌লুম, যাকে দেখে তার বয়সের কথা মনে হয় না। কেবল মনে হয়, সৃষ্টির আদিম ভোরে রূপের দেবতা হয়তো একে দিয়েই তাঁর রূপ-রচনা স্বরু করেছিলেন, আবার তাঁর সৌন্দর্য্য-রচনার কাজ যেদিন শেষ হ'বে সেদিন হয়তো একে দেখেই তাঁর ছবির গায়ে শেষ রেখাটারও আঁচড় পড়্‌বে।

ওর চা'রপাশ যেন রহস্যের জালে ঘেরা। যেখানে ওর সন্ধান পাবো ব'লে ভাবা যায় সেখানে ওর সন্ধান মেলে না—যেখানে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, পাহাড়ের নদীর মতো কোথা দিয়ে ঘুরে' ফিরে' এসে ও সেইখানে দাঁড়িয়েই হঠাৎ হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে।

হয়তো 'ম্যালে' ব'সে আছি—একটা উল্কার মতোই অকস্মাৎ কাছে এসে ইলা বলে—এত লোকের ভিড়ও কি আপনার ভালো লাগে। তার চেয়ে চলুন, পাহাড়ের ঐ ঢালু যায়গাটাতে। নির্জ্জনে ব'সে আমি গান গাইব—পৃথিবীর সব চেয়ে বড় কবির সব চেয়ে নতুন বর্ষার গান। গানের সুরে আলোর দেবতা সাড়া দেয়, আর আপনি সাড়া দেবেন না!

ওর কথার ভেতর রহস্যের যে আমেজ আছে তার রঙ্‌টা যেন ধর্‌তে পারিনে, কেবল কথাগুলোর

বাইরের অর্থ ধরে' নিয়ে বলি—মশা মারতে কামান দাগা মেয়েদের চিরদিনের অভ্যাস। আমার সাড়া ওর চেয়ে ঢের ছোট জিনিসেও পাওয়া যায়। কিন্তু গানের সম্বন্ধে আমাকে আপনি যে সার্টিফিকেট দিলেন সে সার্টিফিকেটটা আপনাকে ফিরিয়ে নিতে হ'বে। জানেন তো গানকে যারা ন্যায্য মর্য্যাদা দিতে পারে না মহাকবি তাদের সম্বন্ধেই বলেছেন···

ইলা তাড়াতাড়ি হেসে বলে—থাক্ আপনার মহাকবির বয়াৎ—ও আর আপনাকে আওড়াতে হ'বে না। তার চেয়ে গান শুনুন।

সুরের হাওয়া পাহাড় ছাপিয়ে আকাশের তীরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সুরের আগুন ভুবন ভাসিয়ে মনের দোরে এসে দীপালীর দীপ জ্বালায়।

গান কখন থেমে যায় টের পাইনে। হঠাৎ এক সময় চেয়ে দেখি, ইলা চলে' গেছে। চোখের সাম্‌নে অন্ধকারের পর্দ্দাটা ঘন হ'য়ে ওঠে। সুরের শিখায় পথ দেখে নিয়ে ঘরে ফিরে' আসি।

হয়তো কেটলিতে জল ফুটছে টগ্-বগ্, চা ছেড়ে দেবো, হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে' ইলা বলে—ভারি

চা'র পিপাসা পেয়েছে, তাই ঢুকে' পড়্লুম আপনার ঘরে। জানি এখানে এলে এক পেয়ালা চা পা'বোই। এইবার দিন পেয়ালা-পিরিচগুলো সব আমার হাতে। একটু থেমে আবার বলে—কিন্তু সকালে তো আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেছ্লুম।—যান নি যে বড়? আমার হাতের তৈরী চা ভালো লাগে না বুঝি?

নিমন্ত্রণ হয়তো করেছিল—হয়তো বা করে নি। তবু না যাওয়ার কথাটাই বড় হ'য়ে বুকে বাজে। হেসে বলি—লক্ষ্মীর হাতের সুধার পরিবেশন ভালো লাগে না, আমার মতো লক্ষ্মীছাড়া যারা, তারাও তো সে কথাটা হলপ ক'রে বল্‌তে পারে না। বিশ্বাস না হয় এক কাপের যায়গায় তিন কাপ দিয়েও পরীক্ষা করতে পারেন।

চা'র পেয়ালার চুমুক দিয়ে বলি—কেন যে পুরুষ অন্ন ও পানীয় পরিবেশনের ভার গৃহ-লক্ষ্মীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন আপনার তৈরী চাতে চুমুক দিয়ে তার কারণ বোঝা যায়।

চা'র স্নিগ্ধ গন্ধে মন মেতে ওঠে। তার ফেনোচ্ছল গৈরিকের রঙ্‌ মনের দোরে বসন্তের পীতবাসের জয়-

পতাকা তুলে' ধরে। মদ তো তাই যা মনকে মাতাল ক'রে তোলে। সমুদ্র-মন্থনের দিনে যখন সুধা ও উর্ব্বশী এক সঙ্গে উঠে' এসেছিল তখন দেবাসুরের ভেতর আপোষ যে কেন সম্ভব হয় নি তার কারণ বুঝতে আর এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় না। সেই যে সমুত্থিতা উর্ব্বশী তার দীপ্তিই তো জ্বলছে ইলার চোখে। তার ডান হাতে যে অমৃতের ভাণ্ড ছিল তার অমৃত-ধারাই তো পূর্ণ ক'রে তুলেছে আমার ঠোঁটের সুমুখের ঐ পানপাত্রটা। যে মাতাল কবি মদের বন্দনায় তাঁর কাব্যকে অমর ক'রে রেখে গেছেন কেবলমাত্র সুরার সুরভিতে তাঁর জীবনও তো ভ'রে ওঠে নি। তাই মদের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উর্ব্বশীর বন্দনার শ্লোকও রচনা করতে হয়েছে—তাঁকেও বলতে হয়েছে—

"and thou
Beside me Singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise enow."

মনের ঘোড়া বল্গাটাকে আল্গা পেয়ে দুঃসাহসের সেই দুর্গম মরু-পথ দিয়ে ছুটে' চলে যে মরু-পথের সীমা নেই—শেষ নেই, অথচ যার বুকে বুকে মরীচিকার মন-ভোলানো মায়াটাও জড়িয়ে আছে।

ইলাকে বাড়ীর দোরে পৌঁছে' দিয়ে ফিরে' আস্‌তে চাই, ইলা বলে—অজয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না—সে আপনাকে পেলে ভারি খুসী হ'বে।

সত্যি অজয় খুশী হ'বে, না—এ আমাকে আরো খানিকক্ষণ ধ'রে রাখ্‌বার ফন্দী—বুঝ্‌তে পারিনে। হঠাৎ সমস্ত মন ক্লান্তিতে ভ'রে ওঠে। ভারি কণ্ঠে বলি —না আজ থাক্।

কিন্তু পথের ওপর পা বাড়াতেই সব অবসাদ জলহারা মেঘের মতো মিলিয়ে যায়। মুশৌরী পাহাড়ের গায়ে গায়ে দীপালোকে যে তরুণীদের সভা ব'সে গেছে তাদের চোখের তারা হ'তে আলোর শিখা ঠিক্‌রে পড়ে। বাতাসের বুকে উৎসবের বাঁশী বেজে উঠে' পথের পথিককে আবার পথের মাঝখানেই টেনে নিয়ে যায়।

*   *
*

* *
*

হায় রে পথের খেয়ালী! চিরকাল পথে পথেই যার দিন কাট্‌ল, রাত ফুরালো—মুশৌরী পাহাড়ে সেই রচনা করতে চায় চলা-ভোলবার মাথা-গোঁজবার নীড়! পূবের আকাশে তার আলো ঝরছে সত্য, কিন্তু পশ্চিমের আকাশ যে তার কাল-বৈশাখীর মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল! ঝড় জাগ্‌বারও তো আর দেরী নেই!

স্তব্ধ হ'য়ে ব'সেছিলুম, হঠাৎ নীল রঙের একটা শাড়ী প'রে ইলা এসে ঘরে ঢুক্‌ল। ও যেন নীল মেঘের বুকে অকস্মাৎ বিকশিত বিদ্যুতের একটা রেখা!

ঘরে ঢুকে'ই ইলা বল্‌লে—চলুন বেরিয়ে পড়ি।

আমি বল্‌লুম—এই রৌদ্দুরে।

সে বল্‌লে—পাহাড়ের সজল-জলদ-কান্তি দেখেছেন,

তার বুকের ভেতর মরুভূমির যে দাহটা জলছে তার খবরটাও নেবেন না !

হেসে বললুম—নিজের মনের ভেতরেই যে শাহারার ধূ ধূ বালুচর প'ড়ে আছে, তাই তো পাহাড়ের ও-রূপটা দেখ্‌বার জন্যে আমার লোভ হয় না।

বাইরের রৌদ্রের মতো ঠোঁটের কোণে একটা দীপ্ত রোদের রেখা ফুটিয়ে তুলে' সে বল্‌লে—এত বড় দুনিয়াটার কত ভাগ মরুভূমি তা যদি জান্‌তেন, আপনার মনের ঐ ছোট মরুভূমিটার দাহ ঢের ক'মে যেতো। কিন্তু আর দেরী নয়, এইবার উঠুন।

আদেশ মেনে নিতে হ'লো। কিন্তু বাইরে বেরিয়েই বুঝ্‌তে পারলুম আপ্‌শোষ কর্‌বারও কিছু নেই। রোদ যেন ইস্পাতের দীপ্তি। আর সেই দীপ্তিতে পাহাড়ের অন্তর্লোকের অণু পরমাণুগুলো পর্য্যন্ত যেন দেখা যাচ্ছে।

সেদিন পথের পাহাড় ভাঙ্‌তে গিয়ে দুপুরের যে রূপটা চোখে পড়েছিল এর সঙ্গে যেন তার কোনোখানে কোনো মিল নেই। সেদিন তার সারা গা দিয়ে ঝ'রে পড়্‌ছিল আকাশের শুষ্ক রুক্ষ বীভৎস পিপাসার একটা জ্বালা, চোখে যা মোহ জাগায়, কিন্তু মৃত্যুর মোহ। আজ ঝরছে নিখিলের অনন্ত যৌবনের অফুরন্ত দীপ্তি,

পাহাড়ের মায়া

যে দীপ্তি দিনের ঐ নীল নিচোল আকাশের বুকেও যেমন অপরূপ রূপের আভা জাগায়, ধরণীর এই পীন পয়োধর পাহাড়ের বুকেও তেমনি হীরা-মণি-মাণিক্যের ঝরণা ঝরায়।

দূরে কাছে নীচুতে এবং উঁচুতে ফগের জাহাজগুলো ভেসে চলেছে। হঠাৎ একেবারে সামনে একটা ভেসে এসে চোখে মুখে খানিকটা লোধ্র রেণু ছড়িয়ে দিয়ে গেল। কি স্নিগ্ধ এই রেণুগুলোর স্পর্শ। ফগটা ভেসে চলেছে—মনে হচ্ছে একখানা বরফের ভেলা পাল তু'লে দিয়ে তীর ছেড়ে মাঝ-দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। ইলা হাততালি দিয়ে গেয়ে উঠ্‌ল—

"কোন্ মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে একরাশ
ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস।"

সৌন্দর্য্যের যে পূজারীটি মানুষের দেহে আবরণের আবিষ্কার করেছিলেন তাঁকে নমস্কার। কুয়াশায় ঢাকা ঐ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সৌন্দর্য্যকে সার্থক কর্‌তে হ'লে আবরণ কেবল আবশ্যক নয় একেবারেই অপরিহার্য্য।

দূরে নাভার রাজ-প্রাসাদটা দাঁড়িয়ে আছে—দৈত্যের মায়ায় নিদ্রিত রাজার রাজপুরীর মতো। ঐশ্বর্য্যের তার অভাব নেই, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্যের ভেতর দিয়ে করুণ কান্নার যে উৎস উৎসারিত হ'য়ে ওঠে তারই বা শেষ কোথায়?

ইলাকে বল্লুম—এই মহারাজা রিপুদমনের প্রাসাদ! ইলা কোনো কথা বল্লে না, কেবল প্রাসাদটার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সেই অকথিত দৃষ্টির বাণীর ভেতর দিয়ে অশ্রু ঝরল কি অগ্নি ঝরল ভালো ক'রে ধরতে পারলুম না।

আকাশের বুকে ঝড়ের আভাস জেগে উঠেছে। কষ্টিপাথরের কালো কুচিগুলো কে আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে গেল। বিদ্যুৎ জ্বলছে তার আগুনের সাপগুলো দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে।

বাতাস কোন্ ফাঁকে থেমে গেছ্‌ল—এইবার তারও প্রলয়ের নৃত্য সুরু হ'লো।

ইলাকে বল্লুম—এইবার ফিরে' চলুন।

ইলা বল্লে—ফেরবার তো আর সময় নেই। তার চেয়ে চলুন সাম্‌নের ঐ বাড়ীটাতে যেখানে কোন্ বাদ্‌সা না

পাহাড়ের মায়া

আমিরকে এনে বন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছিল। ঝড়ের আমিরী মেজাজের খেয়ালগুলোকে আমিরের বাড়ীতে দাঁড়িয়েই না হয় আজ উপভোগ করা যাবে।

পাইন্ গাছের ঝাঁক্ড়া মাথাগুলো দুল্ছে—বেলাতটের ওপর ফেটে ভেঙে গর্জ্জে' উঠে' আছ্ড়ে-পড়া সমুদ্রের নীল ঢেউগুলোর মতো। ঝড়ের পায়ে পায়ে বাজ্ছে প্রলয়ের ঝঙ্কনা। তার তাণ্ডব নৃত্যে পথের পাহাড় গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হ'য়ে গেছে। আর সেই রেণুগুলো বাতাসের ফুৎকারে উড়ে' ধূসর অন্ধকারের একটা চলন্ত প্রাচীর গ'ড়ে তুলে' সাম্‌নের দিকে ছুটে' চলেছে।

হঠাৎ একবার ঝড়ের একটা ঝাপ্টা এসে ইলার এলো-খোপা খুলে' তার চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে গেল। এলানো চুলগুলো তার উড়্ছে—তারি সাথে পাল্লা দিয়ে উড়ছে তার শাড়ীর নীল আঁচল। আঁচল তো নয়—ঝড়ের রাণীর জরীর তারে কাজ করা জয়-পতাকা।

সাম্‌নের ধূলোয় পথের রেখা মুছে' গেছে, পেছনের ধাক্কায় পা'র তলা মাতালের মতো টল্ছে। ইলার তনু দেহখানা একবার একটা ধাক্কায় হেলে পড়্তেই আমার

দেহটা ধ'রে আপনাকে সে সাম্‌লে নিলে। কিন্তু ঝড়ের ভাণ্ডারে আরো অনেকগুলো ধাক্কা জমা হ'য়ে ছিল। তারি গুটি কত আবার উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌তেই ইলাকে আর একলা ছেড়ে দিতে সাহস হ'লো না। তাকে বাহুর আশ্রয়ের আলিঙ্গনে ঘিরে' নিয়েই ধীরে ধীরে পাশের সেই পড়ো বাড়ীটার ফটকের ভেতরে ঢুকে' পড়্‌লুম।

ইলাকে দেখাচ্ছে একটা শ্বেত পাথরের মূর্ত্তির মতো। তার মুখের রক্ত-গোলাপের মতো দীপ্তিটা নিভে' গেছে। ঝড়ের তালের সঙ্গে তাল রেখে দুল্‌ছে তার হৃদয়টা। মানুষের দেহের অবসাদ তার মুখের ওপর যে করুণ কান্নার রেখা এত সুস্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে সে ধারণা আমার ছিল না। ধীরে ধীরে ইলার হাতখানা হাতের ভেতর তুলে' নিয়ে বল্‌লুম—ভারি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন বুঝি?

আমার স্পর্শ পাথরের মূর্ত্তিটার ভেতর চেতনার ধারাটাকেই যেন ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। এক মুহূর্ত্তে সচকিত হ'য়ে উঠে' ইলা বল্‌লে—এ যায়গাটা আমার কাছে তীর্থ হ'য়ে রইল কি না—তাই মনটা একটু দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব'লেই সে একটু হাস্‌লে। এ হাসি

সেই হাসি যা মানুষের মুখে রহস্যের যবনিকাটাকে আরো গাঢ় ক'রে টেনে দিয়ে যায়।

বিস্মিত হ'য়ে তা'র মুখের দিকে চোখ্ তুলে' চাইতেই সে আবার বল্লে—পথে ঐ মহারাজ রিপুদমনের প্রাসাদ দেখে এলেন, এখানে এই আমিরের প্রাসাদ দেখুন—ইংরেজের চরিত্রের একটা দিক আপনার কাছে একেবারে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্বে।

আমি হেসে বল্লুম—ইংরেজের চরিত্রের চেহারা ভারতবর্ষের অনেক ব্যাপারের ভেতর দিয়েই ধরা পড়ে। কিন্তু তাতে আমিরের এই পড়ো-বাড়ীটা আপনার কাছে তীর্থ হ'য়ে গেল কেন তার কারণটা কিছুমাত্র সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না।

ইলা বল্লে—তীর্থ তো আমরা সেই জায়গাটাকেই বলি, যেখানে মানুষের মনের নিধি মিলে যায়, যে যায়গাটার সঙ্গে দেবতার স্মৃতির চিহ্ন জড়িয়ে আছে। সকল মানুষের দেবতা তো এক নয়।

আমি বল্লুম—কিন্তু এতেও তো আপনার হেঁয়ালীর অর্থ ধরা পড়্ল না!

ইলা হেসে বল্লে—মানুষের মনের কথা যখন বাহুল্য বর্জ্জিত হ'য়ে বেরিয়ে আসে তখনই তা হেঁয়ালী

হ'য়ে ওঠে। ঝড়কে বাহন ক'রে যে দেবতা আসেন, এর চেয়ে সোজা ক'রে তাঁকে বোঝানও যায় না—বোঝাতে ইচ্ছেও করে না।

হয়তো তার কথা বুঝ্‌লুম—হয়তো বুঝ্‌লুম না। কিন্তু ধীরে ধীরে তার হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লুম—ইলা, ঝড় যার বাহন তার গলায় বজ্রের মালাও দোলে। সেই দেবতার সাক্ষাৎ যদি তোমার মিলেই থাকে, তাকে সহ্য করার মতো শক্তিরও যেন তোমার অভাব না হয়। দুঃখ-দেবতার অগ্নি-স্পর্শ যদি তুমি মনের ভেতর পেয়েই থাকো, আমি তোমাকে সেজন্যে সান্ত্বনা খুঁজে' বেড়াতেও নিষেধ করি। কারণ আমি জানি, সান্ত্বনা পাওয়ার চাইতে বড় tragedy মানুষের জীবনে আর নেই। কিন্তু এইবার চলো, ঝড় জল দুই-ই থেমে গেছে।

দূরে—কত দূরে কে জানে—রোপ্যের রেখার মতো একটা নদীর রেখা এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে। এপারের ঘোলাটে মেঘের প্রান্তটা ভেদ ক'রে সূর্য্যের আলো তারি দেহের ওপর প'ড়ে একটা জরীর পাড়ের মতো জড়িয়ে আছে। আরো দূরে মেঘের বুক ভেদ ক'রে

চির-বরফের দেশের তুষারস্তূপ দেখা যাচ্ছে—ইন্দ্রধনুর মেখলা-পরা স্ফটিকের নতোন্নত স্তম্ভগুলোর মতো। দু'ধারের গাছের পাতা হ'তে বাতাসের দোলায় ইলার কালো চুলে, নীল শাড়ীতে 'বজ্রী'র কুচিগুলো ঝ'রে প'ড়ে হীরের ফুলের মতো জ্বল্‌ছে।

ইলা তো নয়—মায়াপুরীর রাজকন্যা! ঘনীভূত রহস্যের রাজপথের ভেতর দিয়ে তারি সঙ্গে পথ কেটে চলেছি—কোথায় কিছু মনে পড়্‌ছে না। বুকের ভেতর কান্নার সায়র থম্‌কে আছে—অশ্রুর বুদ্‌বুদে ভরা। তার বাধ যদি ভাঙে হয়তো মায়াপুরীর রাজকন্যাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব হয় না।

অকস্মাৎ চেয়ে দেখি—মায়াপুরীর পথ ফুরিয়ে গেছে। লাল বাড়ীটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ক্লান্তকণ্ঠে ইলা বল্‌ছে—কাল ভোরে 'লাল-টিপ্পায়' চ'ড়ে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে হ'বে। সুতরাং ভোর পাঁচটায় 'লাল-টিপ্পার' পথে আবার আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

* *
*

জানালা খুলে' জ্যোৎস্নার কূল-ছাপানো রূপের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছি। সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু কি অপরূপ তার এই অস্পষ্টতার আচ্ছাদন! সাম্‌নের গাছে পাতাগুলো সোনার জলে নেয়ে নীলার মতো নীল হ'য়ে উঠেছে, তার পাশেই একরাশ অন্ধকার জমাট্ কঠিন—হাসির গায়ে গায়ে অশ্রুর ধারার মতো। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বুঝি বা এতক্ষণ আকাশের অপ্সরীদের নৃত্য সুরু হ'য়ে গেছে। তাদের সে নৃত্য চোখে পড়্‌ছে না—কিন্তু পা... বুকে যে উৎসবের নেশা জ'মে উঠেছে তার আভাস পাচ্ছি জ্যোৎস্নার হাসিতে, পথ-ভোলা পথিকের বাঁশীতে।